বাংলা-সাহিত্যের স্বল্প ক'জন মহিলা লেখিকার মধ্যে বাণী রায়ের স্থান নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল। তার প্রমাণ ১৯৬০ সালের দু'টি উল্লেখ্য পুরস্কার দ্বারা স্বীকৃত। কি গল্প, উপন্যাস কবিতা বা প্রবন্ধ রচনায় তিনি শুধু মহিলা হিসাবে উল্লেখযোগ্যই নন, উপরন্তু এক সরব ব্যতিক্রম। নিজস্ব রুচি, মার্জিত স্বচ্ছ দৃষ্টি, বর্ণনার ঋজুতা নিয়ত তাঁর লেখাকে স্পর্শ ক'রে অসাধারণত্ব আনে। আর এই অনায়াস নির্বিকার অসাধারণতা রচনার মুক্তি ঘোষণা ক'রে শ্রেয়ত্বে নিয়ে যায় বলেই পাঠকেরা নিঃসঙ্কোচে মুগ্ধ হয়।

আপাত-জীবনের প্রেমের বাঙ্ময়তা সোচ্চার উপস্থিতি ও অন্তরের গভীরে তার স্বাভাবিক উপলব্ধির সংস্থাপনার জন্য তার রচিত সর্বাধুনিক গ্রন্থ 'প্রেমের দেবতা' এক স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। যে পরিমণ্ডলের স্নিগ্ধতাই বাণী রায়ের সাহিত্য-স্বভাবের বাহক।

বা ণী রা য়
প্র ণী ত

এ সো সি য়ে টে ড পা ব লি শা র্স
ক ল কা তা বা রো প্র কা শি ত

প্রকাশক: নির্মলেন্দু ভদ্র

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। এ/৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা ১২

প্রচ্ছদ-রূপায়ণ। সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

ব্লক নির্মাতা। ব্লক এণ্ড ব্লক

প্রচ্ছদ মুদ্রণ। ফটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মুদ্রাকর। অমলেন্দু ভদ্র। মুদ্রণ ভারতী। ১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ১২

এ. পির নিবেদন। বাণী রায় প্রণীত প্রেমের দেবতা

প্রথম প্রকাশ। মাঘ ১৮৮২ শকাব্দ।

দাম। ২'০০ টাকা

উৎসর্গ

আমার রচনার প্রথম পাঠিকা এবং অনুপ্রেরণাদাত্রী,
শৈশব লেখকের সযত্ন সংশোধনকারী সাহিত্যিক-জননী
শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীকে

১৯৬০ সালে 'লীলা' পুরস্কার ও 'নরসিং দাস'
পুরস্কারে অভিনন্দিতা লেখিকার
অন্যান্য বই।

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ
আরো কথা বলো
প্রেম
পুনরাবৃত্তি
শ্রীলতা ও শম্পা
রঞ্জন রশ্মি
কনে দেখা আলো
জুপিটর

হিসাব নিকাশ রাখ নি কিছুই ;
করেছ কেবল খেলা,
অশোক-পলাশে বিলাস তোমার,
তীর ছুঁড়বার বেলা ॥

প্রেমের দেবতা

/ /

একটি সাধারণ মেয়ের জীবনের একটি কাহিনী শোনাই, এস। মঞ্জুর কাহিনী।

কলেজের বেঞ্চে মঞ্জুর পাশে যে বসেছে, নাম তার অচলা। প্রখর সজ্জা, অঙ্গের আভরণ ও আবরণ জন্ম তার সূচীত করে ধনীগৃহে। নীল রং মঞ্জুর প্রিয়। কলেজের প্রথম দিনে সে একখানি নীল শাড়ি পরেছে, লাল পাড় তার। নীল মেঘের বুকে বিদ্যুৎ যেন,—এমনি একটি উপমা মঞ্জুর মাথায় উদিত হয়েছিল। কিন্তু অচলার শাড়িও তো নীল। সে নীল রংএর নীলিমা আলাদা। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট রেশম ভিন্ন নীলের এমন শেড্ খোলে না। কাছে বসে দেখল মঞ্জু একই রংয়ের শাড়ির পার্থক্য কত! সেই মসৃণ সুকোমল নীলিমার কাছে মঞ্জুর শাড়ি কত কর্কশ, কত দীন; অথচ বাড়ি থেকে বা'র হবার আগে নিজের শাড়িখানা কত সৌখিন মনে হয়েছিল মঞ্জুর।

অচলা হাল্কা গেলাপী সিল্কের রুমালে মুখ মুছলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র সৌরভ চারিদিকের বায়ুস্তর উতলা ক'রে তুললো। উৎসবের দিনে মঞ্জুও বৌদির ঘর থেকে ছিটেফোঁটা পুষ্পসারে নিজের অঙ্গরাগ চর্চিত ক'রে থাকে। সেই মৃদু ভীরু সৌরভ, আর এই প্রগল্ভ আতর! নিত্যকার প্রসাধনে সুরভি ব্যবহৃত অচলার হাতে অনেকগুলো চুড়ির স্বর্ণদীপ্তি মঞ্জুর একটিমাত্র মটর-প্যাঁচ বালাকে ব্যঙ্গ করে। ঈষৎ কৃশ গৌরবর্ণ দেহে রংয়ের উজ্জ্বলতা মাতৃদত্ত এক কাপ দুধ বা কদাচিৎ সন্দেশ যতটা এনেছে, তার চেয়ে বহুগুণ উজ্জ্বলতা আনতে পেরেছে অচলার গাত্রে পিতৃগৃহের আপেল-আঙুরের থোকা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অপরূপ সুন্দর বেশ অচলা মঞ্জুর জগতের থেকে ভিন্ন লোক নিঃসন্দেহে।—হঠাৎ একটা কেমন ব্যর্থতার অনুভূতিতে মলিন হয়ে গেল মঞ্জু।

সাগ্রহে প্রথম আলাপ কিন্তু করলো অচলা-ই—তুমি কি ভাই মঞ্জুশ্রী রায়?

—হ্যাঁ।

—বীণাপাণী বিদ্যাপীঠ থেকে তুমিই তো মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছ!

সপ্রশংস দৃষ্টিতে অচলা মঞ্জুর দিকে চাইলো। দ্বিতীয় বিভাগে অচলার স্থান হয়েছে, তাই মঞ্জু অচলার কাছে বিস্ময়ের বস্তু।

উভয়পক্ষের এই বিস্ময়বোধ বন্ধুত্বের সূচনা করলো সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের

ছুটী কিশোরীর মধ্যে। কলেজের অবকাশপ্রহরে মাঠের প্রাচীন জামরুল গাছের ছায়া সাক্ষী রইল প্রীতি বিনিময়ের। অচলার লেখা-পড়ায় সাহায্য করছে মঞ্জু। অচলা নতুন জগতের স্বাদ দিয়েছে মঞ্জুকে।

একদিন অচলা মঞ্জুর হাত চেপে ধরলো—'কাল ভাই, আমার বাড়ি তোমার চায়ের নেমতন্ন। মা-রা তোমার কথা শুনে তোমাকে দেখতে চান। তুমি আজ-না-কাল ক'রে কাটিয়ে দাও। এবারে আমি ছাড়ব না। কাল কলেজের পরেই আমার সঙ্গে যেতে হবে। বাড়িতে বলে আসবে।

অপরিচিত জগতের সীমানায় পদক্ষেপে কৌতূহল প্রচুর থাকলেও একটু ভীতিও তো আছে! অচলা সাগ্রহে যতবার নিমন্ত্রণ করেছে, ততবারই মঞ্জু ইতস্ততঃ করেছে। অথচ আগ্রহের সীমা নেই। সেবারেও অবশ্য মঞ্জু ক্ষীণ আপত্তি জানালো—'কলেজে সারাদিনের পর কি নেমতন্ন খাওয়া যায়!—থাক্ না।'

—হাঁ, তা তো থাকবেই! আমি টেনে নিয়ে যাবই।

অগত্যা মঞ্জু মাকে বলে রাজি করলো। অচলার গাড়িতে কয়েকদিন বাড়ি এসেছে মঞ্জু। মা অচলাকে বেশ চিনে ফেলেছেন। সহজেই রাজী হ'লেন উনি। বরঞ্চ বললেন সাগ্রহে—'বেশ তো যাবি বৈকি। অচলাকে ফিরতি নেমতন্ন একদিন অবশ্য করতে হবে।'

মঞ্জু আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠল—'কি মজা! সেদিন কিন্তু বৌদির সেতার শুনাতে হবে।'

বৌদি তার ছাদের বেল-জুঁই-এর টবে নিষ্ফল জল ঢালছিল। ফুল তারা কখনই দিতে জানে না। রথের মেলায় সস্তা দামের চারাগাছ বেঁচে যে আছে তাই ঢের।

বৌদি হেসে উঠলো—'শোন কথা! আমার সেতার তোমার দাদার কানেই মধু ঢালে শুধু। তোমার বড়লোক বন্ধুর ভাল লাগবে না। কত ভাল বাজনা ও নিশ্চয় শুনেছে।'

মা শোবার ঘর থেকে মঞ্জুর তুলে-রাখা পোষাকী পেনডেণ্ট হার হাতে ক'রে বেরিয়ে এলেন—'কাল সকালে উঠলেই তো অফিস কলেজ এক সঙ্গে, গয়না বা'র করার সময় পাব না। এই হারছড়া আজই পরে রাখ।'

মঞ্জু বিনা বাক্যব্যয়ে আটপৌরে ক্ষয়ে-যাওয়া বিছে হার খুলে মায়ের হাতে

দিল। গোটের সঙ্গে গাঁথা ঝক্‌ঝকে নতুন পেন্‌ডেণ্ট। দার্জিলিং-এর লাল পাথর বসানো। অনাগত শুভদিনের আশায় মা বানিয়ে তুলে রেখেছেন। ধনী বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার আগে নিজে শ্রীযুক্তা হওয়া সমীচীন। বৌদি সুযোগ বুঝে বললেন—'আমার কঙ্কণ জোড়া পরে নাও মঞ্জু। বালাটার পালিশ বলে কিছু নেই আর।'

—ইস্‌, তোমার ওই মোটা-মোটা হাতের কঙ্কন আমার হাতে লাগলে তো !

বৌদি হাসিমুখে জবাব দিল—'ওগো সপ্তদশী, আজ আর তোমার হাত আমার হাত আলাদা নয়। পরেই দেখ না !'

বৌদির কঙ্কন হাতে উঠল মঞ্জুর। একটু ঢল্‌ঢলে হ'লেও নেহাৎ বেমানান দেখাল না।

এখন সমস্যা পোষাক নিয়ে। সারাদিন থাকতে হবে কলেজে, বিকেল চারটা পর্যন্ত। ততক্ষণ বেশভুষা শ্রীহীন হয়ে যাবে। তাছাড়া, সারাদিন কলেজে পরে থাকার পক্ষে জমকালো শাড়িও অশোভন দেখাবে—মা বললেন—'কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে মুখহাত ধুয়ে পরে গেলেই পারতিস।'

মঞ্জু বললো—'না না মা, অচলা তা হ'লে আবার ওর গাড়ি দৌড় করাতো। আমার ভারি লজ্জা করে।'

সুতরাং, দুই কূল বজায় রাখার চেষ্টা করাই ভাল। মা বাক্স খুলে নিজের একখানা জরিপাড় টাঙ্গাইল বার ক'রে দিলেন। নতুন নীল রেশমের জামাটার সঙ্গে বেশ মানাবে। চাঁপাফুলের রং শাড়িখানার। মা রঙীন শাড়ি পরা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বধূ ও কন্যাই তাঁর রঙীন শাড়ির মালিক। তবে বিশেষ কোন স্মৃতির জন্য আদৃত শাড়িখানি আজ পর্যন্ত তোলা ছিল। তাই তার জরি একটুও মলিন হয় নি, রং উজ্জ্বল আছে। আসন্ন আনন্দ যেন শাড়ির পাটে পাটে ছড়ানো। মঞ্জুর আনন্দের পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

কলেজ যাবার আগে সুসজ্জিত মঞ্জুর দিকে চেয়ে বৌদি বাঁকা হাসির সঙ্গে রসিকতা করলো—'মহারানী, কোন মালঞ্চের মালাকর যদি এই রূপে দেখত !…'

মঞ্জুর মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হয়তো এতক্ষণ তার অবচেতন মন এই কামনাই করছিল। বৌদির রসনায় সেই কামনাই ভাষা পেয়েছে।

—কি যে বল, বৌদি !

—ঠিক কথাই বলি। সুমিতা এক লাইন গান গেয়ে উঠলো—

'এপারে মুখর হ'ল কেকা ঐ
ওপারে নীরব কেন কুহু হায়।'

—আরে ছি ছি, বৌদি। তোমার হ'ল কি !

—আচ্ছা তা হ'লে আবার রবীন্দ্রনাথ—

'কোন সে ভিখারী হায়রে,
এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,
তাই সব মম ধনজন মাগিল রে,
আজি মর্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে।'

কই, এমন বাসর ঘরের রসিকতা বৌদি আগে তো কখনও করে নি? কিন্তু—লজ্জা পেলেও অপ্রতিভ হচ্ছে না তো মঞ্জু? ভালো লাগছে তার।... সামনের আয়নার বুকে ছায়া পড়েছে যার, সে আর কিশোরী নয়, সে তরুণী।

অচলার বাড়ি কখনও দেখে নি মঞ্জু। গেটের মধ্য দিয়ে প্রাচীরঘেরা বাঁধানো উঠানে গাড়ি থেকে নামলো দু'জনে। সরু রাস্তার বুকে বনেদী সেকালের বাড়ি। একপাশে সারিসারি মোটরের আস্তাবল। ঝক্ঝকে গাড়ির বনেট দেখা যাচ্ছে বন্ধ দরজার ফাঁকে ফাঁকে। অন্যপাশে চাকরদের আলাদা একতলা সরু বাড়ি চলে গেছে। মধ্যে নানারকম ফুলের গোল কেয়ারীর চূড়ায় তীর-ধনুক হাতে মর্মরের বিলিতি কিউপিড মূর্তি। সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সাদা-কালো বারান্দা কেটে দোতালার সিঁড়ি চলে গেছে সাদা পাথরের। অচলার পায়ের শব্দে নিচের বারান্দার পাশ থেকে বেয়ারা ছুটে এলো বই-এর বোঝা হাত থেকে নিতে। মঞ্জুর বইখাতাও অচলা তারই হাতে তুলে দিল—অচলার পড়ার ঘরে চালান হয়ে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠল তারা প্রকাণ্ড চাতালে, অয়েলপেন্টিং আর দেয়ালগিরি দিয়ে সাজানো। চাতাল দিয়ে অনেকগুলো ঘর টানাটানিভাবে চলে গেছে। বড় বড় মেহগিনি দরজার ফাঁকে ফাঁকে সোফা-চেয়ার সাজানো। একটা দরজার কারুকার্যখচিত পরদা তুলে অচলা তাকে বসালো সাজানো বসবার ঘরে।

—এখানে একটু বোস মঞ্জু, মাকে ডাকি।

অচলা বড়লোক সত্য—জানতো, মঞ্জু। কিন্তু, বড়লোকীর রূপটা এমন জানতো না। এতটা সে তো আশা করে নি, এতটা সে ভাবতেও পারে নি।

সিনেমায় দেখা ছাড়া জীবনে ঐশ্বর্যের এমন রূপ মঞ্জুর কিশোর মনের ধারণায় ছিল না। প্রকাণ্ড চেস্টারফিল্ডের গদিতে ডুবে যেতে অস্বস্তি বোধ হ'ল মঞ্জুর। এত নরম আসনে সে আগে বসে নি। স্প্রিঙের আরামে ডুবন্ত শরীর, পা উঠে এসেছে পারসিক গালিচা থেকে। কেমন যেন অসুবিধা হয়।

নকল অগ্নিকুণ্ডের ওপরে ম্যান্টল্‌প্লেসে ড্রেসডেন চায়নার কৃষাণী সাজানো, রাক্ষুসে শামুক, রূপোর ফ্রেমে আলোকচিত্র। দুইপাশে দুটো মার্বেলের প্রতিমূর্তি, আলো হাতে। দেওয়ালে তিব্বতী ওয়ালপ্লেট। মার্বেলের টেবিলে রূপোর ফুলদানী। একপাশে পিয়ানো। ড্যামাস্ক-পরদা, আলোর বাহার।···ঘরটির যেন মঞ্জুর জীবনে আকস্মিক আবির্ভাব, এমন ঘরও জগতে আছে!

মঞ্জুর জীবনের সমস্ত সুর আচ্ছন্ন ক'রে অচলার ঐশ্বর্যময় পটভূমিকা বিনিদ্র রাহুর মত জেগে উঠলো।···অতীতের কিছুই যেন এত মনোহর নয়! তারা সকলেই সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরাস্ত হ'ল।···আধো-অন্ধকারের শীতলতার মধ্যে মঞ্জুর জীবনে নবীন সুর যোজিত হয়ে গেল।

অচলা মায়ের সঙ্গে প্রবেশ করলো। এই সাদা মর্মরমূর্তির মতই গাত্রবর্ণ তাঁর? প্রৌঢ়ত্ব ও মাতৃত্ব যৌবনের শাণিত দীপ্তি কোমল করেছে। স্বভাবরক্ত অধরে হাসি বাৎসল্যের রসসিক্ত।

—এই তোদের সেরা মেয়ে? বেশ।···থাক, থাক মা। পায়ের কাছে লুণ্ঠিত মঞ্জুকে তুলে ধরলেন তিনি।

অনেকদিন থেকেই সাধ ছিল খুকুর, তোমাকে বাড়ি আনে। তা খুকু, তোরা কলেজ থেকে ফিরেছিস। চা-টা খেতে খেতেই গল্প করা যাক। মঞ্জু নিশ্চয় মুখহাত ধোবে।

—হ্যাঁ, ওকে বরঞ্চ আমার বাথরুমে নিয়ে যাই। এস মঞ্জু।

অচলা মঞ্জুর হাত ধরে টেনে বারান্দার অপরপ্রান্তের ঘরে ঢুকলো। প্রকাণ্ড বড় ঘর, খাটে সাদা সূক্ষ্ম মশারী এখনই ফেলা আছে। ওপরে পাখা। নিচে কার্পেট বিছানো। এপাশে আর একটি পাখার নিচে একখানি বিশাল কাউচ, পাশে ফুল সাজানো! লম্বা ড্রয়ারের মাথায়ও ফুলের পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

একজোড়া নরম চটি মঞ্জুর পায়ের কাছে ধরে দিয়ে অচলা মঞ্জুকে ঘরের

সঙ্গে লাগাও বাথরুম দেখিয়ে দিল, পাশে ছোট ড্রেসিংরুম। প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাথরুম। মঞ্জুর তিনখানি ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণটা অচলার শোবার ঘরের পরিধিতে ধরানো যায়।

বাথরুমে বাথটাবের পাশে আলনা থেকে একখানা তোয়ালে নিয়ে কোনমতে ঝক্‌ঝকে বেসিনে হাতমুখ ধুয়ে ফেললো মঞ্জু। আয়নার সামনে সরু কাঁচের তাকে কতরকম তেল, সাবান, বাথসল্ট ইত্যাদি। এই অচলাকে প্রতি-নিমন্ত্রণে নিজের ফ্ল্যাটবাড়ির তিনখানা ঘরে নিয়ে যাবে ভেবেছিলে মঞ্জু! কি ক'রে সে অচলাকে সমকক্ষ ভাবতে পেরেছিল?

নিজের ঘরকে আজ সকালেও কত সুন্দর মনে হয়েছিল মঞ্জুর। শান্তি-নিকেতনী পর্দায় আবৃত সাজানো ছোট ঘর। টেবিল, চেয়ার, বইখাতা কত ভাল লেগেছিল ওর নিজের চোখে। সে চোখ তখনও অচলার ঘরখানি দেখে নি কি না!

আস্তে তোয়ালেটি গুছিয়ে রাখলো মঞ্জু। ছোট একটি পাখাও আছে সিলিং-এ আঁটা। কাঁচের জানালার অর্ধেক ঢাকা ফুলতোলা পর্দায়। ওজন নেবার যন্ত্র একটা রাখা আছে।···যদি বাথরুমের এত বাহার, শোবার বা বসবার ঘর তো অমন হবেই।

ড্রেসিংরুমে ড্রেসিংটেবিলের সামনে টুলে বসে পড়লো মঞ্জু। এত সব প্রসাধনের দরকার আছে কি ছাত্রজীবনে? তবু কি সুন্দর পাত্রগুলো, হাতের তেলোয় পাউডার ঢেলে সন্তর্পণে একটু মুখে ছোঁয়ালো।···এই আয়নায় মঞ্জু যেন বেমানান। কেমন নিষ্প্রভ-দীন লাগছে ওকে। সকালে কলেজে আসবার আগে মঞ্জুর আয়নার তরুণী যেন হারিয়ে গেল এ-বাড়ির আয়নায়।

মঞ্জু কাপড়খানা ঝেড়ে পরলো। মায়ের বুদ্ধি নিয়ে কলেজের পর বাড়ি হয়ে সুসজ্জিত অবস্থায় আসাই উচিত ছিল। যত বাঁচিয়ে চলুক না কেন, কাপড়খানা অগাছোলা হয়ে গেছে। এই সাজ মঞ্জুর বাড়ির পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এ বাড়ির পক্ষে যথেষ্ট নয়।

বসবার ঘরে চায়ের সরঞ্জামের সামনে বসবামাত্র মঞ্জুর আবার এধারণা স্বীকৃত হ'ল। বাসন্তি রংয়ের শাড়ির জরিপাড় মায়ের হাতে যতটা উজ্জ্বল দেখিয়েছিল, এখানে মলিন দেখালো। অচলার কাকীমা একখানা সাদা শান্তিপুরী শাড়ি পরে এসেছেন! তার জরির দিকে তাকিয়ে চোখ ঝল্‌সে যায়। অচলার

খুড়তুতো বিবাহিত বোন এখন এখানে আছে। তার আটপৌরে শাড়ির মত পোষাকী শাড়িও মঞ্জুর একখানা নেই। অচলা ভাল শাড়ি পরে কলেজে যেত। কিন্তু, তাদের বাড়ির সাজটাও কি এত জমকালো?

অচলার মা প্রকাণ্ড গোল টেবিলের ধারে চায়ের পাত্র বিতরণ করতে লাগলেন। রূপোর চায়ের পট, চিনিদানী, দুধের জাগ, চিনি তোলার চামচ ইত্যাদি। নীলাভ ছবি আঁকা চায়ের পাত্র পাতলা ডিমের খোলার মত। ঘরে তৈরী সন্দেশ, কেক, মাংসের কাবাব, করাইশুঁটির কচুরী, মাছের সিঙাড়া।—খাবার-গুলো মঞ্জুর জিহ্বায় অপরিচয়ের স্বাদ বহন ক'রে আনলো। এই ধরণের রান্না-খাবার মঞ্জু আগে কখনও আস্বাদ করে নি। বড়লোকের বাড়ির খাদ্য আর মধ্যবিত্ত ঘরের খাদ্য বাইরে একজাতীয় হলেও জাত-ই আলাদা।

বৌদির নতুন কঙ্কণপরা নিজের হাত দু'খানিকে কত সজ্জিত মনে হয়েছিল মঞ্জুর। অচলার মায়ের বিশ ভরির চুড়ি-বালা পরা হাত চায়ের কাপ ধরে এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে চায়ের পাত্র নিতে যেয়ে মঞ্জু দেখলো বৌদির কঙ্কণ কত ক্ষীণজীবি, কত কম সোনায় কত কষ্টে গড়া। অচলার খুড়তুতো বোন উস্রীর হাতেও অবশ্য একজোড়া কঙ্কণ আছে, তার কারুকার্য ও গঠনই আলাদা। অচলাকে এই দলে যেন কেমন অপরিচিত বোধ হচ্ছে। অচলাও এদের-ই একজন। …কিন্তু, অচলা যে সহ্য হয়ে গেছে মঞ্জুর।…অচলা যে বন্ধু হয়ে গেছে। এদের সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধানে কোন্ সেতু মঞ্জু বাঁধবে?

উস্রী কেমন যেন কটাক্ষ ক'রে মঞ্জুকে দেখছে।—মঞ্জুর যে সাজ মা বৌদির কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছিল, সে সাজ এখানে কত সাধারণ। পুরণো বাসন্তী রং শাড়ির খোল কি এত জ্যাল্‌জেলেই ছিল? না, এখানকার বস্ত্র-উৎকর্ষের কাছে এমনি দেখাচ্ছে।

অচলার কাকীমা জিজ্ঞাসা করলেন—'কোথায় থাক তুমি?'

মঞ্জু কবীর রোডের নাম করলে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—'কলেজ তো দূরে। যাতায়াতের অসুবিধা হয় না?'

মঞ্জু সাগ্রহে উত্তর দিল—'না, আমাদের রাস্তা থেকে একটু দূরেই বাস। উঠে বসলেই কলেজের সামনে নামা যায়। আবার ছুটি হ'লেই ইচ্ছামত ফিরে আসতে পারি। বাড়ির কাছে বাস থাকায় খুব সুবিধা হয়েছে।'

এতক্ষণে এই বনেদী বাড়ির পারিবারের কাছে একটা কোন কথা বলতে

পেরে মঞ্জু স্বচ্ছন্দে কথা বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা নীরবতা অনুভব ক'রে সচকিত হয়ে পরমুহূর্তে বুঝতে পারল।

মেয়েদের সাধারণ বাসে চলাফেরা এঁদের কাছে হীনতাজনক। তায় একা-একা। সুতরাং এঁরা অস্বস্তি বাধ করছেন। মঞ্জুর কাছে এঁরা অপরিচিতের ভীতি নিয়ে যতটা দুর্বোধ্য, এঁদের কাছে ততটাই অপরিচিত।

উশ্রী নীরবতা ভঙ্গ করলো—'শুনেছিলাম, মঞ্জু ভাল গান গায় একটা গান হোক না। তুমি কোন্ ওস্তাদের কাছে শেখ ভাই?'

এবার মঞ্জু মাথা নামিয়ে বললো—'ওস্তাদ আমার নেই। আমি সপ্তাহে দু'দিন একটা গানের স্কুলে গান শিখি।'

উশ্রীর ভদ্রতাসূচক হাসি ঢেকে অচলার মা বললেন—'একটা গান গাও না মঞ্জু। তুমি বোধ হয় পিয়ানো বাজাও না। ওই যে অর্গান।'

বিরাট বৃহৎ অর্গান। মঞ্জুর অর্গান বাজানো অভ্যাস নেই। তার গানের স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে অর্গানের স্থান ছিল না। সুতরাং ভয়ে ভয়ে মঞ্জুকে বলতে হ'ল—'আমি অর্গানে গান গাই না।'

অচলা বলে উঠলো—'তুমি একহাত দিয়ে বক্স-হারমোনিয়ামের মত ক'রে বাজাও না! নইলে কাকার মহাল থেকে বক্স্ আনতে হয়।' অচলার কাকীমা বললেন—'আমাদের ছাওরের সব রকম যন্ত্রের সখ আছে। গানবাজনা নিয়ে দিনরাত কাটে ওর।—তা অচলা যা বলছে, তাই কর না, মঞ্জু।'

অগত্যা সেই বিরাট অর্গানের সামনে চক্রাকার চামড়ার আসনে বসে বিপদ-গ্রস্ত হ'ল মঞ্জু। বন্ধুদের বাড়ি কখনও অর্গান দেখা ও সখ ক'রে বাজানো ঘটলেও এমন অর্গানের চেহারা মঞ্জু আগে দেখে নি। দু'ধারে বাতিদান, মন্দিরের মত আকার। অতিকষ্টে কেবল মাথা খাটিয়ে মঞ্জু কোনমতে একহাতে কাজ চালানো সুরের ঠেকা দিয়ে একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলো।

মঞ্জুর আনাড়িপনায় এ বাড়ির লোকেদের মনোভাব যাই হোক, মৌখিক ভদ্রতা ও সমাদরে তাঁদের আভিজাত্যের ত্রুটি তাঁরা রাখলেন না। অচলা বাড়ির ছোট মেয়ে। তার বন্ধুকে তাঁরা যতই অপাংক্তেয় ভাবেন, প্রকাশ না ক'রে ভাবনাকে চাপা দেবার জন্য তাঁরা সমাদরের আতিশয্য দেখালেন।

অচলা গীটার বাজায়। সে গীটারে ইংরেজি বাংলা দুই সুরই শোনাল।

তারপরেই লাফিয়ে উঠে মঞ্জুর হাত ধরে টানলো—'এখন আমরা একটু নিজের ঘরে গল্প করতে যাচ্ছি। আইসক্রীম ওখানেই পাঠিও।'

ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। কাউচে মঞ্জুকে বসিয়ে অচলা মস্ত অ্যালবাম খুললো।

—ভাই মঞ্জু, এসো আমার পরিবারের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ধরে নাও এঁরা ছবি নন, সত্যি মানুষ।…এই যে বাবা। এই উস্রীদির বাবা, বড় কাকা আমার। উস্রীদির স্বামী আই, সি, এস—এই তাঁর ছবি। আমার ছোটকাকা আর ঠাকুরদা, ঠাকুরমা। ওঁরা দুজনে কাশীতে গেছেন—সঙ্গে গেছেন আমার বড়দা-বৌদি! এই ওঁদের ছবি। বৌদি ভাল গান গাইতে পারেন। এই উস্রীদির ছোট ভাই মণ্টু; ভারি দুষ্টু।…এই আমার ছোড়দা, ঘোড়সওয়ারের পোষাকে। অক্সফোর্ডে আছেন।

কথার জাল আচ্ছন্ন ক'রে একটা ক্ষীণ স্বরের রেশ ভেসে এল। বড় পাকা হাতের, বড় গুণী হাতের ঝংকার। মুগ্ধ মঞ্জু অ্যালবাম সরিয়ে বলে উঠলো—'বাঃ! কি চমৎকার!'

—আমার ছোটকাকা সেতার বাজাচ্ছেন। কোন গানের সাড়া পেলেই তারপরে ওঁর সেতার বেজে ওঠে। নিশ্চয় তোমার গান উনি শুনতে পেয়েছেন।…এস না, শুনবে কাছে যেয়ে।

বারান্দা ও থাম দিয়ে পৃথক কয়েকটি ঘরের সমষ্টি। আলাদা 'মহল' বললেও কাছের পাল্লা। মঞ্জুকে নিয়ে একখানি ঘরে প্রবেশ করলো অচলা। ঘরে কেবল মাত্র গালিচা পাতা। সারা মেঝে ঢাকা তাতেই। ওপরে মখমলের তাকিয়া। নানারূপ বাদ্যযন্ত্রে ঘর পরিপূর্ণ। আলোর দিকে পেছন ফিরে জানালার দিকে মুখ রেখে একজন সেতার বাজিয়ে চলেছেন। অতি মৃদু নীলাভ আলোয় তাঁকে রূপকথার রাজপুত্র বলে মনে হ'ল।

দীপ্ত গৌর সৌম্যমূর্তি।…তরুণ না হ'লেও প্রৌঢ় নন। অপরূপ রূপময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মুখের প্রতিটি রেখা। পাশে মুসলমান ওস্তাদের হাতে তবলার সঙ্গত চলেছে।

স্তব্ধ মুগ্ধ মঞ্জু শুনে গেল নিখুঁত জয়জয়ন্তীর আলাপ।…এই কাকার ভাইঝিকে সে বৌদির সেতার শোনাতে চেয়েছিল!

সেই সুর সারা গৃহের নিথর রাত্রিকে বারবার আবেশে আবেগে দুলিয়ে দুলিয়ে অবশেষে নিস্তব্ধ হ'ল। অচলা ধীরে ডাকলো—'কাকামণি!'

—কে, খুকু? এসো।

—কাকামণি, আমার বন্ধু তোমার সেতার শুনে খুব খুশী হয়েছে। এ হচ্ছে আমাদের মঞ্জু। এর কথা তো তুমি শুনেছ।

হাতের সেতার রেখে যন্ত্রী এদিকে মুখ ঘোরালেন। নীল আলোয় তাঁর নীলাভ চশমায় ঢাকা আকর্ণ চোখ দু'টি কত সুন্দর, মঞ্জু দেখতে পেল না। তবু মনে হ'ল জীবনে এত সুন্দর পুরুষ সে দেখে নি।···একেই সুন্দর বলে। সুন্দরের হাতে সুরসৃষ্টি।

অনেকদিনের চেনার মত তিনি বললেন—'মঞ্জু বোস। তোমাকে তুমিই বলছি। খুকুর বন্ধু তো।···হ্যাঁ, তোমার কথা আমি ঢের শুনেছি। এত শুনেছি যে তোমাকে আমি চিনে রেখেছি। তুমিও তো সেতারী, মঞ্জু।···একটু শোনাবে?'

লজ্জায় মঞ্জুর গালিচার বুকে মিশে যেতে ইচ্ছা হ'ল। এঁর কাছে সেতার ধরবে সে?

—কি চুপচাপ যে? একটু আগে তো মুখর ছিলে বেশ। গান শুনেছি।

অচলা বললো—'বাজাও না, ভাই। কাকামণির মত সমঝদার তুমি পাবে না।'

—না, না আজ থাক। আমি তো ভাল বাজাই না। আপনার কাছে বাজাতে হ'লে অভ্যাস ক'রে আসতে হবে।

মৃগাঙ্কমৌলির বঙ্কিম অধরে মধুর হাসি দেখা দিল—'বেশ, কয়েকদিন পরেই দোলপূর্ণিমা। সেদিন তবে আমার আসরে তোমার নিমন্ত্রণ রইলো।'

সারা দিনরাত্রি এমন মধুর হয়ে ওঠে কেন।···যন্ত্র শুনে, না দেখার মত রূপ দেখে? সেই ঐশ্বর্যের পটভূমিকা মঞ্জুর অনাড়ম্বর দিনে ক্রমাগত ছায়া ফেলে। সহজে তৃপ্তি, অল্পে প্রীতি চিরদিনের মত মঞ্জুর জীবন থেকে চলে যেতে চায়। ঐশ্বর্যের রূপস্বপ্ন মঞ্জুকে উদাস ক'রে বিমনা ক'রে তোলে।

মা বলা সত্ত্বেও অচলাকে ফিরতি নিমন্ত্রণে ডাকতে আর পারলো না মঞ্জু। রাজার দুলালীকে তার অতি সাধারণ, বিশেষত্ববর্জিত দিনযাত্রায় ডাকে সে কেমন ক'রে? জ্ঞানবৃক্ষের ফল সে খেয়েছে ইভের মত। সঙ্কোচ এসে গেছে তার। শুধু সে দোলপূর্ণিমার দিন গণে। মনে মনে জয়জয়ন্তীর আলাপ আবার শোনে। বার বার।

শুধু কি সেতার সমঝদারকে শোনানো, অথবা শোনা? ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু নয়

শুধু ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর রূপস্বপ্নে তরুণী তন্ময়। মৃগাঙ্কমৌলির ব্যক্তিত্ব ক্ষণকালের মধ্যেই কুমারী সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে কি? অথবা জীবনে যে ঐশ্বর্য চোখে দেখে নি মঞ্জু, সেই ঐশ্বর্য তাকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে?

নতুন স্বর এই যে জীবনে বাজে, এ স্বর শেষ হবে কোথায়? নিজের বাড়ির পরিবেশ ছেড়ে তরুণীর আত্মা সেই একদিনের দেখা মর্মর-প্রাসাদে পারসিক গালিচার ওপর পদক্ষেপ করতে চায়। হাতে তার বাজে একবোঝা চুড়িবালা। ঝকঝকে জরিপাড় শাড়ির আঁচল সে কি মাথায় টেনে দিল? কার কল্যাণ কামনায়?

মৃগাঙ্কমৌলির সেতার মঞ্জুকে পাগল করেছে। সে ওই রূপবান পুরুষের হাতে যন্ত্রের মত বাজতে চায়। দেবতার মত মানুষের দেখা সে পেয়েছে। নারীর জন্মসত্বের সন্ধান বুঝি এতদিনে পেল মঞ্জু।

মায়ের আশা, বৌদির পরিহাস, নিজের আধো বিহ্বলতা ধীরে ধীরে উন্মেষিত হচ্ছিল। সে স্রোতের টানে অন্য পথে চলে গেল। এখন উন্মেষ অন্যজনকে বেষ্টন ক'রে। এই উন্মেষ সার্থক কি ব্যর্থ, মঞ্জু জানে না।

দোলপূর্ণিমা এসে গেল। সারাদিন আবীরের রং-এর মাতামাতি মনকেও রাঙিয়ে গেছে। বৌদির রসালো পরিহাস বার কয়েক ননদিনীকে লক্ষ্য ক'রে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হাসিমুখে মঞ্জু পরিহাস সহ্য করেছে, কিন্তু মন তার পল গুণেছে। কখন সন্ধ্যা আসবে, কখন নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে। আজিকার চাঁদ নিশ্চয়ই অনেক মনোহর, অনেক স্নিগ্ধ হয়ে উঠবে। মঞ্জুর জীবনের প্রথম চন্দ্রোদয়।

সন্ধ্যায় সাজ করল মঞ্জু বহুক্ষণ ধ'রে যত্ন ক'রে। আজ নিশ্চয় ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলবে। আজ নিশ্চয় চশমার আড়ালে দুটি চোখের দৃষ্টি সে দেখবে। সেই চোখ দেখবে তাকে, সে দেখবে সেই চোখকে। আবক্ষ আয়নায় প্রতিফলিত হবে উভয়ের দৃষ্টি বিনিময়।

সুনীল-বসনপ্রিয়া আজ কিন্তু পড়লো উৎসবের রং—তার সবচেয়ে জমকালো শাড়িখানা, রক্তগোলাপের মত লাল, জরির পাড়গাঁথা। দাদার বিয়েতে ননদ পুঁটুলির শাড়ি। আবীরের লালে লাল দিনে লালশাড়ি।

আয়নায় নিজের মুখ ভাল ক'রে নানা ভঙ্গিতে দেখলো মঞ্জু। মৃগাঙ্কমৌলির চোখ দিয়ে নানা ভাবে দেখলো নিজেকে। না, আর কিছু নয়। অমন গুণী,

অমন ঐশ্বর্যবান, অমন সুপুরুষের সম্মুখে যাবার মত যোগ্যতা চাই তার।

আজ গাড়ি নিয়ে অচলা এসেছে। রুক্ষ্ম চুলে তার সাবান লেপনে রং-মোচনের চিহ্ন।

—বা, তোমাকে আজ ভারী ভাল দেখাচ্ছে, মঞ্জু। অচলা সপ্রশংস ভাবে বললো।

শাড়ির মত মঞ্জুর মুখে রক্তিমা। গাড়ি এগিয়ে চলেছে অচলার বাড়ির দিকে। মঞ্জু একটু লজ্জিত ভাবে বললো—'আজ দোলের দিন, তাই।'

—ভালো করেছ। আমরা সবাই সন্ধ্যায় আজ লাল শাড়ি পরবো।

মঞ্জু ভীতভাবে বললো—'খুব বড় পার্টি না কি?'

—না, ভাই। আজ ছোটকাকার মহলে একটু গান-বাজনা হয়। আমরা শুনি সবাই।

—তোমার ছোট কাকা বুঝি লাল রং পছন্দ করেন?

অচলা মঞ্জুর দিকে তাকালো—রং পছন্দ? না। তোমাকে ছোট কাকার সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয় নি, মঞ্জু।

—কি? কি কথা? মঞ্জু রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলো।

—আমার ছোটকাকা অন্ধ।

এই সাধারণ মেয়েটির জীবনের সমস্ত সুখের ওপর যবনিকাপাত হ'ল। প্রেমের অন্ধ দেবতার এ-ও বুঝি এক পরিহাস।

ঘুম কোথায়?

আমার ঘুম আসে না! আমার ঘুম আসে না! বিনিদ্র রজনীতে নীলাকাশের একটি স্পন্দিত তারকার দিকে চেয়ে থাকি। জানালার লতাপাতা-কাটা গরাদে মুখ রাখি, নিচের কাল ইস্পাতের পাড়ের মত পীচের রাস্তা নির্বিবাদে নিদ্রা যায়। জানালার পাশে রক্ষিত পুষ্পাধারে ঘুমায় আরক্ত গোলাপগুচ্ছ। প্রকাণ্ড আয়না লেসের ঝালরের নীচে সুপ্তিমগ্ন থাকে। কোন অসুখী মুখ সেখানে ফুটে ওঠে না। বিজলীর বাতি বিশ্রাম-মগ্ন থাকে। কিন্তু, আমার ঘুম কোথায়?

উঠি। মর্মর ত্রিপাদীতে রক্ষিত জলাধার। জল পান করি। বৈদ্যুতিক

ব্যজনীর শক্তি বাড়িয়ে দেই। বারান্দায় চলে আসি। প্রকাণ্ড বাড়িতে সকলে সুপ্ত। আমার ঘুম কোথায়?

ঘুম কোথায়? ঘুম কোথায়? আলো জ্বালাই! আয়নার পরদা সরাই। ফুটে ওঠে দীর্ঘাঙ্গী শ্যামার চিত্র। লালপাড় শাড়ি রাত্রি-শয়নে অবিন্যস্ত। মুখ চোখ বিশীর্ণ—অতৃপ্ত।

কই, সে কোথায়? কিছুদিন পূর্বে শ্যামা তরুণী ছিল মোহিনী। এমন অতৃপ্ত ছিল না সে। সে গেল কোথায়। সমগ্র দেহে তার দেদীপ্য ছিল অনল, কোথায় গেল সে অনল? অনল? অনল গেল কোথায়?

এস তোমরা, নিশীথ-জাগরণ যাদের চিরসঙ্গী। এস তোমরা, আমার চারপাশে বোস। শোনাই আমার কাহিনী।

সারা জীবন আমার ছিল একটি রেসের ঘোড়া। তার লক্ষ্যপথে উন্মত্ত আবেগে সে ছুটছিল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে। হঠাৎ রেস শেষ হ'য়ে গেল। গন্তব্য স্থলে পৌঁছে অশ্ব দেখল তার আর কিছু করবার নেই।

যদি আমার সেদিনের মনোভাব দুই হাতে ধরে ছবির মত তোমাদের দেখাতে পারতাম! বসন্ত-বাতাসের মত লঘুচিন্তা কিশোরী। প্রাণ শক্তিতে ভরপুর। অবস্থাপন্ন পিতার আদরিণী কন্যা।

পঞ্চদশবর্ষ বয়সে জলন্ত পাবকশিখা চোখে পড়ল। নয়নে মদনভস্মকারী সে রূপ জ্বলে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে সর্বদেহে ব্যপ্ত হয়ে গেল। প্রতি রোমকূপে অনল দেদীপ্যমান লেলিহান ক্ষুধায় জ্বলে উঠল। তোমরা, আজকালের তরুণ-তরুণী প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম বোঝ কি?

তাকে দেখলাম। আচ্ছা! সে তো দেখা নয়, কবির ভাষায় দর্শন। আত্মীয়ের বিয়ে বাড়িতে তাকে দেখলাম উজ্জ্বল-গৌর পুরুষ—ললাটে এলোমেলো চুল। গায়ে শাদা আদ্দির পাঞ্জাবী-স্বেদসিক্ত। কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পানের থালা ছিল আমার হাতে। আমি অভ্যাগতদের তাম্বুল বিতরণের ভার পেয়ে গর্বিত হয়েছিলাম।

দ্বিধা-ভয়-লজ্জা জয় ক'রে তার কাছে অগ্রসর হলাম, থালা ধ'রে বললাম, 'নেবেন?'

সে আমার দিকে চাইল। একটু হেসে একটা পান থালা থেকে তুলে নিল। সেই প্রথম যোগাযোগ।

দান্তে বালিকা বিয়াত্রিচের ছবি মনে গ্রহণ করেছিলেন, শোনা যায়। সারাজীবন তিনি অধরার পশ্চাতে বিচরণ করেন—অবশেষে Divina Commedia-এর স্থষ্টি হয়। আমি কবি নই, আমি কোন অমর মহাকাব্য রচনা করতে পারলাম না। আমার কলমে বিগত শতাব্দীর এলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর আত্মা ভর করল না। তবে, খাতার পাতায় মসীচিহ্ন পড়তে লাগল হৃদয়াবেগের। পঞ্চদশ বর্ষে প্রেম জন্মলাভ করল বাঙালী মেয়ের উর্বর মানসে। বিস্ময়ের কিছুই নেই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অসম্ভব নয় যে, একজন কিশোরী বিবাহ বাটীতে তরুণ যুবককে হৃদয় দান করবে। কিন্তু, বিস্ময় এই যে এ-ভালবাসা Calf-love-এর পর্যায়ে পড়ে অবসিত হল না। আমার তরুণ জীবন আমি কাব্য-রচনা ক'রে গেলাম অধরার উদ্দেশে। ভোলা আমার ঘটল না। সেইদিন থেকে রজনী বিনিদ্র হ'ল।

বিবাহ মিটে গেলেও আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান থাকে। আত্মীয়ের বাড়ি—তারাও আত্মীয়। ক্রমাগত যাতায়াত ক'রে আলাপ ঘনিষ্ঠ ক'রে তুললাম। আমি কলেজে আই-এ পড়ছি। চন্দ্রচূড় চৌধুরী আমার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হ'লেন।

জানি, তোমরা হাসছ। সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি তো? যদি হয়ত, তা হ'লে এ কাহিনীর অবতারণা আমি করতাম না। আমার মত ক'রে ভাল অনেকেই বেসেছে। স্বদেশে-বিদেশে প্রেমের ছড়াছড়ি দেখেছি। চতুর্দশ বৎসরের জুলিয়েত মরেছে। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত পঞ্চদশীর প্রেম টেনে চলা! কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর, সন্দেহ নেই।

আমি কি তাকে আমার প্রেম জানিয়েছিলাম? না। পাণ্ডু নিশা-শেষের চন্দ্রালোক শুধু আমার জাগরণের সাক্ষী ছিল। বিরহিণী রজনীগন্ধা জানত আমার প্রেমের ইতিহাস। বসন্তে কোকিলের নিদ্রাবিহীন কণ্ঠ জানত আমার মনের একাগ্র প্রেম তারই মত মধুর। গঙ্গার জলে জোয়ার লাগত, কলকাতার সন্ধ্যা বাতাসে দুলে উঠত। জাহ্নবীধারা জানত আমার ভালবাসা তারই মত পবিত্র।

আমি পড়াশোনা করতাম দেবতার মন্দিরে পূজারিণীর মত সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায়। চোখ তুলে চন্দ্রচূড়ের দিকে চাইতে পারতাম না। অথচ মন-প্রাণ তন্ময় হ'য়ে থাকত তার উপস্থিতির মাদকতায়। আমার কিছু বলবার থাকলে আমার দিদি এসে সহাস্যে বলত—'চন্দ্রচূড়বাবু, কাল শিখার কলেজে ইংরাজি পরীক্ষা—একটু দেখিয়ে দেবেন। আজ অন্য পড়া থাক।'

বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল চোখ তুলে চন্দ্রচূড় বলত—'কেন শিখা নিজে বলতে পারে না?'

'পারল আর কই? আমাকেই ডেকে আনল।' দিদির সপ্রতিভ হাস্যে চন্দ্রচূড়ের প্রবাল-অধরে ত্রিভুবনজয়ী হাসি জাগত। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম।

চন্দ্রচূড় আসত, বাইরে পড়বার ঘর। উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম। কোন কোন দিন দিদি চলে আসত। আমি বয়সে অনেক ছোট। দিদি বি-এ পাশ করেছে। কত কি জ্ঞানের আলোচনা চলত। আমি শুনতাম। সেই কণ্ঠের সাগরের মত গম্ভীর সঙ্গীতময় ধ্বনি আমার রক্তস্রোতে দোল দিত। চন্দ্রচূড়ের সংস্পর্শে থাকতে পারলেই কৃতার্থ বোধ করতাম।

আষাঢ়ের বর্ষণমুখর অপরাহ্ণ। চন্দ্রচূড় ভিজে আসছে। আমাদের গাড়িবারান্দা থেকে আমি ও দিদি তাকে দেখতে পেলাম। আমাদের গ্যারেজে তিনখানা গাড়ি! অথচ বর্ষাসিক্ত পিচ্ছিল পথে চন্দ্রচূড় অতি কষ্টে দিনমজুরী করতে আসছে। মনে পড়ল বৈষ্ণবপদাবলীর শ্রীরাধার ব্যাকুলতা, বাদরা-ভিসারের পাদ—

'তুরিতে চল অব কি এ বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার রে—'

কিন্তু দিদি হেসে উঠল। সে হাসি জলতরঙ্গ—রাস্তার জলধারার সঙ্গে যেন অনায়াসে মিলে গেল। আমার শ্যাম রং-এর পাশে দীপ্তা গৌরী আমার দিদি। স্বভাবেও তেমনি মিল আছে। আমি মেঘের ন্যায় অন্ধকার, দিদি বিজলীর মত প্রখর।

দিদির হাসির শব্দে চন্দ্রচূড় বারান্দার দিকে চাইলেন। দুটি বিদ্যুতের সাক্ষাৎ হ'ল। বিদ্যুতের মত হাসি চন্দ্রচূড়ের আকর্ণ নয়নে ছায়া ফেলে অধরে নেমে এল। স্থির দৃষ্টিতে তিনি আমাদের দিকে চেয়ে পথে বৃষ্টিধারার মধ্যেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভীরুভাবে দিদিকে সচেতন করলাম—'একেবারে তিনি ভিজে গেছেন যে!'

দিদি অধরদংশন ক'রে বলল আমার দিকে ফিরে—'শিখা তুমি ওঁর শুকনো কাপড় নিয়ে এস। আমি বসাচ্ছি যেয়ে। আর দেখ, বেয়ারাকে চায়ের কথাও বলে যেও।'

মায়ের কাছ থেকে আলমারীর চাবী নিয়ে বাবার ধুতি-পাঞ্জাবী বের করতে দেরী হ'ল বেশ। বেয়ারাকে চা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে পড়ার ঘরে একতলায় নামলাম।

দরজার নীল পরদার পশ্চাতে নীরবতা। কৌতূহলী হয়ে চেয়ে দেখলাম আড়াল থেকে। সিক্ত বসন চন্দ্রচূড়ের সিক্তবাহু দিদির নীলাম্বর-জড়িত কটীদেশে জলবিন্দু অঙ্কিত ক'রে দিচ্ছে। দুটি মুখ বড় কাছাকাছি। চন্দ্রচূড় ও আমারি দিদি!

চন্দ্রচূড় ও দিদি! চন্দ্রচূড়—দিদি! চন্দ্রচূড়ের কাছে পাঠ গ্রহণ করবার পরে আমার অনিদ্রারোগ কিয়ৎ পরিমাণে কমে আসছিল, আবার রজনী নিদ্রাহীন হ'ল।

ডাক্তার চিকিৎসা করতে লাগল—ইন্‌স্‌মনিয়ার। নানা মুষ্টিযোগ চলল। কিন্তু ফল হ'ল না। অবশেষে আমার অনিদ্রা রোগ আমার শারীরিক অবস্থার পক্ষে প্রতিকূল নহে মন্তব্য ক'রে ডাক্তারী শাস্ত্র আমাকে ছাড়ল।

শুনেছি বড় বড় রাজনীতিবিদগণ, সেনাপতিরা নিদ্রা ত্যাগ ক'রে বেশ থাকেন। পঞ্চদশ বর্ষ থেকে আজ পর্যন্ত আমিও মন্দ নেই। ভোরের দিকে তিন-চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে সকাল আটটায় উঠি। দেহ শীর্ণ হ'লেও স্বাস্থ্য ভাল আছে। মাঝে মাঝে ঘুম চোখে নামে—নিটোল শ্যামাভ আঙুরের মত স্নিগ্ধ নিদ্রা। কিন্তু হায়, সেসকল দিন যে বড় দুর্লভ। প্রাত্যহিক তারিখপঞ্জী তাদের ধরতে পারে না। যেদিন আমার জীবনে আমার অধরা নেমে আসে, সেদিন আমার চোখেও ঘুম নেমে আসে।

এখন বুঝতে পার কি মানসিক ব্যাধি আমার কতটা ছিল? একা একা নিজের মনকে নিয়ে বেড়ে উঠেছি। অদ্ভুত ধাঁচের মেয়ে আমি চিরদিনই ছিলাম। কনভেণ্ট স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা সাগ্রহে ও সানুকম্পায় আমাকে 'Queen' বলে আশা ছেড়ে দিয়েছিল। দিদি ও ভাইদের প্রখরতার কাছে আমি ছিলাম নির্বাপিত শিখা।

কিন্তু, গল্প থেকে স্খলিত হ'য়ে লাভ কি? তোমরা তো আমাকে চাও না, আমার গল্প চাও। শোন তা হ'লে।

দিদির সঙ্গে চন্দ্রচূড়ের বিয়ে হ'ল না। চন্দ্রচূড় প্রস্তাব ক'রে প্রত্যাখাত হয়ে অভিমানে চলে গেল। অবস্থা খারাপ বলে বাবা মত দিলেন না। আশ্চর্যের বিষয়, দিদিও কোন আগ্রহ দেখাল না।

আমি আই-এ পাশ ক'রে বি-এ পড়তে গেলাম। কিন্তু আমার সানুনয় অনুরোধ সত্ত্বেও চন্দ্রচূড় আমাকে পড়াতে চাইল না। এম-এ পাশ ক'রে গৃহশিক্ষকতা করছিল। মফস্বল কলেজে কাজ নিয়ে চলে গেল।

আমি একাই পড়াশোনা করতে লাগলাম। দীর্ঘ দুই বৎসর কাটল বিনিদ্র বিরহ রজনী যাপন ক'রে। দিদির বিবাহ হয়ে গেল। চন্দ্রচূড়ের ঠিকানায় নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হ'ল। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আমি একখানি ক'রে চিঠি প্রত্যেক মাসে তাকে লিখতাম। সে কখনও উত্তর দিত না। স্থানীয় লোকের মুখে জানতে পারতাম তার কার্যকলাপ। মেয়ে-ছাত্রীরা না কি তার অত্যন্ত বাধ্য।

অভিমানী, তোমার অভিমান কার উপর? সারা জীবন যে তোমার পথের দিকে সূর্যমুখীর মত নিজেকে মেলে দিয়ে চেয়ে ছিল, কই, কখনও মানুষ হিসাবে তাকে কোন মূল্য তুমি দিলে না তো? ধনী পিতার কন্যাকে কেবল ছাত্রী হিসাবে তুমি গ্রহণ করেছিলে। কর্তব্য ক'রে গেছ। আমার হৃদয়ের অখণ্ড প্রেমের দিকে ফিরে চাও নি। তোমার প্রেমের মূল্য কিন্তু কড়ায়গণ্ডায় চেয়েছিলে। আমার দিদি অভ্যস্ত আরাম ত্যাগ ক'রে তোমার গলির ঘরে ভাত রান্না করবে? যে তা পারত, যে জীবনের চরম সুখ বলে দারিদ্র্যকে কণ্ঠে ধারণ করত, তার কথা তোমার মনে হ'ল না?

দুই বছর পরে সহসা চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল প্রদর্শনীক্ষেত্রে। একটি সুন্দরী তরুণীর পাশে হাস্যমুখর চন্দ্রচূড়। আমি কেবলি তোমাকে অন্যের পাশে দেখব?

আমার ব্যগ্র অভ্যর্থনার উত্তরে নীরস—মামুলি ভদ্রতাসূচক কয়েকটি উক্তি। বুঝলাম প্রত্যাখানের অপমান সে ভোলে নি!

শুনলাম, চন্দ্রচূড় মফস্বল থেকে চলে এসেছে ভাল লাগে না বলে।

এখানে কাজ খুঁজে নেবে। সঙ্গিনী তার গৃহপতির কন্যা।

আবার ঠিকানা সংগ্রহ, আবার চিঠি লেখা, সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল অনুরোধ। যে কলকাতার আকাশ আমার উপরে ছায়া দিচ্ছে, চন্দ্রচূড়ও সেই আকাশের নিচে! এই তো, বাতাস আমাকে স্পর্শ ক'রে দ্রুত চলে গেল তার দিকে। বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়ল আমার কবরীতে, তার চুলের ব্যাকব্রাশে। দুই বছর পরে এত কাছে, অথচ এত দূরে? এত দূরে?

অশনিচমকের পীড়ায় শুনলাম চন্দ্রচূড় বিয়ে করেছে। আমার ভালবাসা আরও বর্দ্ধিত করল। চন্দ্রচূড়, তুমি যে সবদিকেই আমার আদর্শ।

আরও দু' বছর। নিশ্বাস রোধ করা আরও কয়েকটি বছর। আমি এম-এ পাশ ক'রে বিদেশে গেলাম। চন্দ্রচূড়ের প্রেম আমাকে লেখিকা করেছিল। বিদেশে জার্নালিজ্‌ম্ পড়ে দেশে ফিরে প্রেস ক'রে মাসিক পত্রিকা বের করলাম। আটাশ বৎসরের জীবনে মোহ আসে নি বলতে পারব না, কিন্তু স্থায়ী প্রেম হয় নি। হয় তো আমার ভীরু-নিঃসঙ্গ মন দায়ী। কিম্বা, কাজ আমার নেশা হয়েছিল। কাজের মধ্যে ফাঁক ছিল না।

আর, মনের গোপন অর্গলিত কক্ষে যে দেবতা বিরাজ করত, বাইরের সকলেই যে তার কাছে পরাজিত হ'য়ে মাথা নামাত। রূপে স্বদেশে বিদেশে তার তুলনা পাই নি। তার মহত্ব আমাকে পদানত ক'রে রেখেছিল। তার ব্যক্তিত্ব তারই যোগ্য। পনেরো বছরের কিশোরীর মনে যে ছবি আঁকা হয়েছিল তা জলের রঙে নয়—পাথর খোদা। সে প্রেমের মোহ অতিক্রম করা আমার সাধ্য নয়। তাই বোধ হয়, বিয়ে করতে পারলাম না।

সে কি মূর্তি। প্রশান্ত ললাটে দ্রারিদ্র্যের জয়তিলক। বিশাল নয়নে অতীতের প্রেম। হাস্যময় অধরে আন্তরিকতার ছাপ। হোক সে আমার কাছে পাথর, তবু আমি তারই পূজারিণী।

দেবদাসী এ দেশেরই মেয়ে। আমিও দেবদাসী। বিদেশের চা-ঘরে বসে শ্বেতাঙ্গ যুবকের সঙ্গে পরিহাসের মধ্যে মধ্যে মনে ভেসে আসত—দূর অন্ধকার গলির ঘরে বসে আছে সে। তার প্রতিভা ছিল, কে বুঝবে? তার স্ত্রী কতটুকু তাকে বোঝে? তার অটুট স্বাস্থ্য, অনন্য রূপ ওখানে কতদিন থাকবে? সে কেন আমাকে ভালবাসতে পারল না? কেন সে আমার পরিবর্তে দিদিকে বেছে নিল? কেন আমার ভোগের পাত্র আমি তার

ওষ্ঠের কাছে তুলে ধরতে পারলাম না? মনে বেজে উঠত Dowson-এর অমর কবিতা—

'Last night, ah yesternight, betwixt her lips and mine
There fell thy shadow, Cynara! the breath was shed
Upon my soul between the kisses and thy wine;
And I was desolate and bowed my head:
I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion.'

চন্দ্রচূড়, তোমারি মত পুরাতন স্মৃতিতে আমার মোহ, আমার স্বপ্ন অতীতকে ঘিরে।

স্বদেশে জমিদার তনয়ের পাশে রোলসে বেড়াতে যাই। হভানার ধূম্রজালের মধ্যে জেগে ওঠে একটি মুখ। সেই মুখ।

চিঠি লিখি, মাঝে মাঝে দেখা হয়। ঘনিষ্ঠতা চন্দ্রচূড় এড়িয়ে চলে। বিগত চার-পাঁচ বছর বাইরের কলেজে একটি ছোট কাজ পেয়ে চলে গেছে। কলকাতা তাকে কাজ দিতে পারল না। দুর্দশা ও দারিদ্র্যের চরম রূপ তাকে দেখতে হচ্ছে, জানি। তিনটি সন্তানের জন্মের পর থেকে তার স্ত্রী রুগ্না।

আমি গিয়েছিলাম। আমার ঐশ্বর্য নিয়ে আমি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকি নি। কিন্তু, সে যে চিরদিনই অধরা রইল।

গলির মধ্যে গাড়ি ঢোকে না। গাড়ি বাইরে রেখে গেলাম। সে তক্তপোষের উপর নীচু হ'য়ে বসে পরীক্ষার নোট বই লিখছিল। স্বনাম-ধন্য অধ্যাপক সামান্য টাকার বিনিময়ে তার বিদ্যা ও পরিশ্রম কিনে নেবে। চন্দ্রচূড় ক্রমাগত কাশছে—ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছে। পাশের ঘরে রুগ্না ছেলে—মেয়েকে শাসনের নামে প্রহার করছে। চন্দ্রচূড়ের স্থায়ী কাজ নেই। অপরাধীর মত প্রবেশ করলাম।

আশ্চর্য সেই রূপবহ্নি, আমার পতঙ্গহৃদয় যাতে আত্মাহুতি দিয়েছিল। বিশীর্ণ রূপ হোমাগ্নির ন্যায় জ্বলছে। আমার ঐশ্বর্যকে বিদ্রূপ করছে তার নগ্ন-নিরাভরণ দারিদ্র্য।

চন্দ্রচূড় মুখ তুলল—'শিখা, তুমি আবার এসেছ? তোমাকে না বারণ করেছি। এখন বসন্তের সময়—গলির মধ্যে সব বাড়িতেই ব্যারাম। আমার মেয়েটারও জলবসন্ত হয়েছে।'

প্রদর্শনীর সঙ্গিনীকে নয়, গরীবের ঘরের কন্যাদায় সে উদ্ধার করেছে। আমাকে কোন খবর সে দেয় নি। যে আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ পূর্ণ ক'রে আছে, তার কি জীবনের সর্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্তে আমার কথা মনে পড়ল না?

আঘাত? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আঘাত অসহ্য। যারা প্রেমাস্পদকে অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়, তারাই মাত্র জানে আমার কি সহ্য করতে হ'ল। অনেক সহ্য করেছি তার জন্য। এবারও করলাম।

আমার অবচেতন মন চন্দ্রচূড়ের মন্ত্রবদ্ধা সঙ্গিনী হবার ইচ্ছা হয়তো পোষণ করত, জানি না। সজাগ মানস কখনও সে স্পর্ধার সাহস পায় নি। তার সদয় ব্যবহার আমাকে স্বর্গ দিতে পারত। ভাবলাম, অন্যকে বিয়ে করুক না কেন, আমাকে সে যদি নিজের জীবনে যেকোন ভাবে একটু স্থান দেয় তবেই আমি ধন্য হব।

দিদি বেড়াতে এসেছিল। আমাকে বলল—'জানিস শিখা, আমার শ্বশুরের অফিসের এক কেরাণীর মেয়েকে তোর সেই মাস্টার মশায় বিয়ে করেছেন। সম্প্রতি ক্যানসার রোগে শয্যাশায়ী। চন্দ্রচূড় চৌধুরী বিয়ে ক'রে বড় মেয়ের দায় উদ্ধার করেছে।'

গৌরবে আমার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তুমি আমার কাছে ধরা দাও নি। কিন্তু আমি জানি তুমি আমার শ্রদ্ধার কতটা যোগ্য। আমার ভালবাসা উপযুক্ত পাত্র পেয়েছে, সন্দেহ নেই।

আমার নিরুত্তর মুখের দিকে কটাক্ষে চেয়ে দিদি আবার বলল—'শুনেছি মেয়ে দেখতে ভাল নয়। লেখাপড়াও কিছু করে নি তেমন। কি দেখে ভুলল কে জানে? শুনেছি, মেয়ের ছোট ভাই পথে আলাপ ক'রে চন্দ্রচূড়কে ধ'রে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। তারপরে করুণা-পরবশ হ'য়ে শ্রীমান মেয়ের বাবার কথা রেখেছেন।'

আনন্দে আমার চোখে জল আসল। তুমি তোমারি মত মহৎ? তোমাকে কে বোঝে?

'হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে
তোমারে করিতে পারিনে সেবা।'

নানা ছলছুতার আশ্রয় নিয়ে গেলাম চন্দ্রচূড়ের বাড়ির সন্ধান পেয়ে অনেক

চেষ্টায়। স্যাঁৎসেতে ছোট দু'টি ঘর গলির মধ্যে। অতি সাধারণ কালো একটি মেয়ে, মুখের হাসিতে তৃপ্তির আভাস। অমন স্বামী তার।

জলন্ত পাবকের মত রূপ চন্দ্রচূড়ের মলিন হয় নি। বরঞ্চ, নিয়মিত দিন-যাত্রার শৃঙ্খলায় আরও উজ্জল হয়েছে।

চন্দ্রচূড় সাগ্রহে আমাকে জীর্ণ ঘরের মধ্যে এনে তক্তপোষে বসাল। প্রদর্শনীর নীরস ভদ্রতা নয়, আন্তরিক আপ্যায়ন। এখনও সে কাজ পায় নি। ছেলে পড়িয়ে সংসার চলছে।

বধূ চা-খাবার করতে উঠে গেল। চন্দ্রচূড় আমার পিঠে অতি সহজে হাত রেখে সস্নেহে বলল—'ছাত্রীদের মধ্যে দেখছি আগাগোড়া তুমিই আমার খবর রাখ। আমি খবর নেই বা না নি, তুমিই একা ফিরে ফিরে আসছ। তোমার সঙ্গে আমার বোধ হয় একটা যোগ আছে, কি বল?'

জীবনে প্রথম চন্দ্রচূড় আমাকে স্বেচ্ছায় স্পর্শ করল।

অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তির মাধুর্যের মধ্যে ডুবে গেলাম। শিথিল স্নায়ু অবচেতন মনের গোপন প্রশ্ন বেঁধে রাখতে পারল না, বলে ফেললাম—'দিদির কথা মনে আছে?'

চকিতে চন্দ্রচূড়ের স্নেহকোমল হাতখানি আমার পিঠের ওপর কঠিন হ'য়ে গেল। ভাবলাম, এই বুঝি সে আবার নীরস ভদ্রতার দুর্গে আত্মগোপন করবে।

কিন্তু মুহূর্তপরে স্বাভাবিক স্বরে সে বলল—'চার বছরের কথা মানুষ এখনি ভোলে কি? আমার জীবনের প্রথম প্রেম।'

আলো জলবার পূর্ব মুহূর্ত। কনে-দেখা আলো গলির চির নিরানন্দ দূর ক'রে আকাশে ফুলঝুরি জেলে দিয়েছে। বিজলী বাতি জলবার পূর্বমুহূর্ত।

চন্দ্রচূড়ের গভীর সঙ্গীতময় কণ্ঠ আমার শ্রবণ মন আচ্ছন্ন ক'রে বাজতে লাগল—'ভুলেছি? এই যে আমি তোমার কাছে বসে আছি, তোমাকে আদর করছি—এর মধ্যে তোমার দিদি আছে। দু'জনের মধ্যে সে বসে আছে—সব সময় সে থাকে। যে-কোন মেয়ের কাছেই যাই না কেন।'

এক মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আমার জীবনে চন্দ্রচূড়কে পাবার আশা কত ভ্রান্ত। তবু, তোমার কথাই যে, ভয়ে-ভয়ে বললাম—'আমার আপনার সঙ্গে একটু কাজ আছে।"

'তোমাদের কাজ আমাদের মত লোকের সঙ্গে! বল কি, তা, শিখা? ওই চেয়ারটাতে বোস।'

হায়, এখনও আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিমান গেল না? ধনীর বিরুদ্ধে নিঃস্বের চিরন্তন অভিমান।

—চন্দ্রচূড়বাবু, আমি একখানা বাংলা কাগজ বা'র করেছি, জানেন বোধ হয়। আপনাকে কাগজটার ভার নিতে হ'বে।

—কাগজের তো অন্য সম্পাদক আছেন। তিনি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি।'

চন্দ্রচূড়ের কণ্ঠে কোমলতার আভাস নেই। মরিয়া হয়ে বললাম—'পশুপতি বাবু এখন প্রেসে যাচ্ছেন। কাগজের ভার আপনাকে নিতেই হবে। বড় আশা ক'রে এসেছি। আমাকে ফেরাবেন না।'

বন্দী প্রমিথিয়ুসের আর্তনাদ শুনলাম—'শিখা, শিখা। আমি তোমাকে হাতে ধ'রে শিক্ষা দিয়েছি। তুমি অন্ততঃ আমাকে কৃপা করতে এসো না।'

আমার অন্ধ ভালবাসার উদ্দেশ্য! তুমি চিরদিনই সাধারণ মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার উর্ধ্বে। আমি পরাজিত হ'য়ে ফিরে যাচ্ছি। তোমার বেদনার কণামাত্র আমি দূর করতে পারলাম না। সে গ্লানি অন্তর্যামী জানেন। তবু এ পরাজয়ে আমার ভালবাসার জয়। তোমার প্রেম অযোগ্যকে বেছে নেয় নি।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কেটে গেল। চন্দ্রচূড় বাইরে চলে গেল! একখানি এক লাইন চিঠি এবারে সে কৃপা ক'রে লিখল—'শিখা, দরকার হ'লে তোমার কথা ভুলবো না। চন্দ্রচূড় চৌধুরী।'

মাঝে মাঝে সে কলকাতায় আসলে ক্ষণকালের জন্য দেখা হোত। চিঠি আমি লিখতাম। সে কদাচিৎ উত্তর দিত। ইতিমধ্যে আমার কাগজ ও প্রেস প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হ'য়ে গেল। বিয়ের অবসর রইল না।

আমার সুদীর্ঘ কাহিনী হয় তো তোমাদের বিরক্তি উদ্রেক করছে। ভাবছ ত্রিশ বৎসরের চিরকুমারীর নীরস কাহিনী শুনব। ঘুমহারা ব্যাধি-গ্রস্থার পাথর পূজা! ক্ষতি কি? পাথরের ফাঁকে ফাঁকেই তো ফুল ফোটে।

আমার ঘুম কোথায়? সে অধরা জীবনে ধরা দিল না। তাই ঘুমও চোখে ধরা দেয় নি। যদি সে আসে, ঘুমও আসবে। আমার তন্দ্রার অন্তরালে সে পলায়ন করবে, তাই কি ঘুমতে পারি না?

কিন্তু অধরা যদি ধরা না দিয়েই থাকত তা হ'লে আমার জীবনে কাব্য লেখা যেত। দান্তের যদি বিয়াত্রিচে ঘরণী হতেন 'স্বর্গীয় নাট্য' হয়তো লেখা হোত না।

মানুষ ধরতে চায় কিন্তু মানুষ কি জানে যে ধরার মধ্যে সুখ নেই। প্রত্যাশার পরিণতি প্রত্যাশা অপেক্ষা অনেক খর্ব। যুগে যুগে যত মানুষ সৃজন ক'রে গিয়েছে, তাদের পশ্চাতে আছে মিলনের পটভূমিকা নয়, বিরহের যবনিকা।

সহসা চিঠি পেলাম দুই বছরের অদর্শনের পরে—'শিখা, একদিন তুমি আমাকে কাজের ভার দিতে চেয়েছিলে। আমি নিতে পারি নি। এখন আমি পারব। এখানে কাজের গোলমাল হচ্ছে। ছেড়ে দিয়ে দিন পনেরোর মধ্যে কলকাতায় তোমার সঙ্গে দেখা করব। চন্দ্রচূড়।'

আমার মন নৃত্য ক'রে উঠল। এতদিনে তোমাকে আমি পেতে বসেছি। আমার অধরা, এতদিনে তুমি আমাকে ধরা দিতে আসছ! কিন্তু, না-পাওয়ায় অভ্যস্ত মন বিশ্বাস করতে চায় না।

এ কাহিনীর সূত্রপাত যে রাত্রে, তার পূর্বের অপরাহ্নে সে আসল। দীর্ঘকাল পরে দুই ঘণ্টা সে আমার সঙ্গে কথা বলে গেল। পাঁচ ছয় বৎসর পরে মুখোমুখি এত কথা। সেই চন্দ্রচূড়। দারিদ্র্য ও পাড়াগাঁর অবাঞ্ছিত সঙ্গ তোমাকে অবশেষে ভেঙে ভিন্ন রূপ দিয়েছে? যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ গিয়েছে।

দেহ স্থূলকায়, মাথায় টাকের আভাস, বর্ণ মলিন, বেশ অপরিচ্ছন্ন। কথাবার্তাও দেহেরি মত স্থূল। আমাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা আদ্যন্ত। তোষামোদের সুর লেগেছে কণ্ঠে। যার আসন আমার মনের দেউলে, সে আজ আমারি দ্বারে ভিক্ষার্থী! এর চেয়ে তার মৃত মুখ দেখাও আমার পক্ষে ভাল ছিল।

চিরদিন ধরে নারীর জীবনে যে চিরন্তন ট্রাজেডি—বদ্রাওন-কুমারীর ট্রাজেডি আবার আমার জীবনে অভিনীত হ'য়ে গেল। রেসের ঘোড়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেখল তার গন্তব্যস্থল বাস্তবে মেলে না। অধরার স্বপ্ন-জীবনে ধরা দিতে এসে অন্যরূপ নেয়। আমার জীবনেও কেশরলাল মরল।

কাল হতে চন্দ্রচূড় আমার বেতনভুক ভৃত্য মাত্র। অবশেষে অধরাকে আমি ধরেছি। এবারে সে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে। কাল থেকে সে আমার বন্দী।

আজ রাত্রে আমার বিনিদ্র নয়নে জগতের সব নিদ্রা নামবার কথা। কিন্তু, আমার ঘুম কোথায়? ঘুম কোথায়?

পিক্‌নিক্‌

পোড়ো বাগানে পিক্‌নিক্‌ চলছে। বাগানের বাইরে রাস্তায় দু'খানি মোটরগাড়ি, তিনখানি টাঙা অপেক্ষা করছে।

ধামাভর্তি তৈজসপত্র, বেতের বাক্সে খাবার, ঝোলাতে চয়ের ঠোঙা, টিনে জমা দুধ। ছোটখাটো সরঞ্জাম নিয়ে যেন একদিনের খেলাঘর পাতা হয়েছে।

শালবন ঘিরে উদাস বেলাটি নেমে আসছে ধীরে ধীরে। গাছের বাসায় ক্লান্ত সুনো পাখি দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। ফাল্গুনের বাতাস একটু গরম হ'লেও মিষ্টি। নিরালা পাহাড়ের বুকে অলস দ্বিপ্রহর।

প্রকাণ্ড আমের বাগানে পিক্‌নিক্‌ চলেছে। বাতাস মুকুলের গন্ধ নিয়ে বয়ে আসছে। ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে গায়ে মাথায় পাতা ঝ'রে পড়ছে। লাল ধূলো উড়ছে। পাশের শালবনে ফুলের গন্ধে বুলবুলি থেকে থেকে গান গেয়ে উঠছে।

ইঁটের উনুনে কাঠের আগুন। পোলাওর হাঁড়ি আগুনের মাথায়। গাছের ছায়ায় কাকীমার লালপাড় শাড়ির দোলা। মিস সেন ছাতা হাতে পড়ন্ত রোদ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। কাকা একখানা বই নিয়ে তন্ময়। খাবার তো এখনও দেরী আছে। ও পাশে সতরঞ্চে বসে হাবুল আর রাকা গান গাইছে।

আমরা বিদেশে আসি নি। নিজের দেশেই পিক্‌নিক্‌ করছি। কাকীমা উদ্যোগী হয়ে এই পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করেছেন। তাই অনেক লোক একদিনের আনন্দে আজ মিলিত হ'লাম।

একটু দূরে, পাথরের ওপরে আমাদের দার্শনিক বসে আছেন একা। তাঁর বঙ্কিম অধর কি চায়ের কাপেই সোহাগ জানিয়ে নিরস্ত হ'বার জন্য নির্মিত হয়েছিল? গায়ের সাদা চাদর পাহাড়ী বাতাসে এলানো—প্রেয়সীর আলিঙ্গনে নয়। দীপ্ত চোখ তাঁর দূর চক্রবালে, দিগন্তে কার সন্ধান চলছে। ভুলো মনে তাঁর পথের সন্ধান মেলে না।

আমাদের দার্শনিকের সন্ধানের বস্তু কি, আমি জানি না। শুধু জানি, যেদিন দেখা হয়েছে, সেইদিন থেকে আমি ওই নিষ্ঠুরকে প্রাণ সমর্পণ করেছি।

তুমি সংযত, তুমি সুন্দর। তোমার বয়সের ভার আমাকে শুধু মর্যাদা

দিয়েছে। তুমি অপরূপ প্রৌঢ়। তোমার গজদন্তের দুর্গ তোমার বয়স। সেখানে তোমার আশ্রয়। তাই আমি, কিশোরী, তোমার সন্ধানের লক্ষ্য নই।

বাতাসে আমের গাছে সাড়া জাগে। আমার মন নিজের প্রেম নিয়ে একলা গোপনে কাঁদে—অযত্নে কাঁদে। তবুও তো তোমার বনে মর্মর জাগে না!

যত কাছে আসি, তুমি আরও যেন দূরে যাও। কিন্তু, যত বাধা বাড়ে, আরো তত ভালবাসি।

হে আমার সূর্য, আমি সূর্যমুখী। শুধু তোমারি আলোকে আমার পরাগ বিস্তার হয়।

শালগাছের পাশে অরিন্দম বোস বোয়ার পাইপ দাঁতে চেপে আমাকে লক্ষ্য করছে। পিতার আদেশে সে আমার নির্বাচিত, ভাবী স্বামী। তবু আজকের পিক্‌নিক্-এ আমি এসেছি তার জন্য নয়, তোমারি জন্য। নিরালা প্রান্তরে তোমার ক্ষণসঙ্গ আমার কামনা।

আর কতদিন আমার সহস্র আশা, আমার মূক ভালবাসা গোপনে কাঁদবে? কতদিন তুমি আমার কাছে বসেও দূরে উধাও হবে? সূর্যমুখীর শুধু কি দিন গোনাই সার?

আধুনিক কাব্য নিয়ে পিক্‌নিক্ যাত্রীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে গেল। কাকীমার বোন আমাকে সালিশী মানল। তুমি আমার দিকে চকিতে চেয়ে কৌতুকের হাস্যে বললে, 'এমি, তুমি যে তর্কে এমন চুপ ক'রে?'

তুমি কি নিষ্ঠুর! তোমার কাছে কে ভাই-এর ব্যবহার চেয়েছে, বল? বয়সের অজুহাতে তুমি আমাকে পিতার মত উপদেশ দাও? তোমার এত কাছে আমি বন্ধুভাব নিতে আসি নি। তোমার জানা দরকার।

সেই আমের মুকুলগন্ধে উতলা অপরাহ্ণ পাহাড়ের ধারে শালবনের পাশে নেমে এল। দীর্ঘদিন শেষ হ'বার মুখে। দুপুরের পোলাওর হাঁড়ি এখন শুকনো পাতার স্তূপে গড়াগড়ি খাচ্ছে। হাবুল-রাকা সতরঞ্চির ওপর শুয়ে পড়েছে! মিস সেনের ছাতা বন্ধ। কাকীমা, কাকা, অরিন্দম ও আরও অনেকে তাস খেলছে। চায়ের জল সেই ইঁটের উনুনে বসানো।

দার্শনিক এখনও দূরে সরে বসে আছেন। কাকার বন্ধু, কিন্তু কাকার সঙ্গে যোগযোগ নেই ওঁর। চুরুটের আগুনে দুই চোখ তাঁর দীপ্ত। তাঁর সন্ধান এই আমবাগানের পিক্‌নিক্ পার্টিতে নেই।

আমার বিশ বৎসরের জীবনে এমন দুর্লভ মানুষ আমি আর দেখি নি। তারুণ্যের অবসানেও পৌরুষ সৌন্দর্য কত মোহময় থাকতে পারে প্রথম দেখেছিলাম দুই বৎসর আগে। চল্লিশের প্রান্তে তিনি দাঁড়িয়েছেন—মর্যাদার শুভ্র শুচিতা কেশমূল নিয়ে। সেই কপালের পাশে একটি দুটি রৌপ্য কেশ আমাদের মধ্যে চীনের প্রাচীর নির্মাণ করেছে।

অনেক যুগ ধ'রে এইভাবে তুমি আমাকে অনেকবার দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অনেকবার তোমার জন্য আমার চোখের জল ঝরেছে। ইংরাজী ঔপন্যাসিকা তরুণী শারলৎ ব্রন্তে ফরাশী ভাষায় প্রৌঢ় ফরাশী শিক্ষক হেজারের কাছে প্রেমলিপি রচনা করেছিলেন। হেজার চিঠির মার্জিনে বাজারের হিসাব টুকে রেখেছিলেন। হেজার শারলতক ভাবপ্রবণ হ'তে নিষেধ করেছিলেন। শারলতের তরুণ মনের শ্রদ্ধাপ্রীতির কোন মূল্য হেজার দেয় নি।

আজ অনেকদিনের বিস্মরণ পার হয়ে আমবাগানের ছায়ায় সেই শারলতের আত্মা পিক্‌নিক্-পার্টির মধ্যে ফিরে এল। কিন্তু এ যুগেও তার ভাগ্য প্রসন্ন নয়। শিক্ষক হেজার এ জীবনেও শারলতের কাছে ধরা দিলেন না।

কিন্তু, আমি তো প্রতিভাশালিনী শারলৎ নই। আমি শারলতের সৃষ্ট 'জেন আয়ার' উপন্যাসের জেন নই। আমি সামান্যা, আমি সিলেটের এমিলিয়া রায়। শুধু দুঃখের সূত্রে আমরা একসঙ্গে গাঁথা হয়ে আছি।

দীর্ঘদিন শেষ হ'য়ে গেল। বিদায়ের সময় শালের বনে, আমের বনে ঘনিয়ে এল। পিক্‌নিক্ শেষ হ'ল। আশা শেষ হ'ল।

বিরহের মসীচিহ্ন টেনে রাত্রি নামল। তোমার গাড়িতে তুমি উঠে বসলে। তুমি রুমাল নাড়লে যাবার মুখে। আমি এগিয়ে এলাম। শুক্‌নো পাতার স্তূপে বিলাপধ্বনি উঠল।

তুমি বললে—'এমি, আর এগিও না। এদিকে অন্ধকার। লক্ষ্মীমেয়ে, ফিরে যাও। আজকের সারাদিনটা আমার বড়ই আনন্দে কেটে গেল।'

তোমার গাড়ি চলে গেল। তুমি নিষ্ঠুর! আমি তো শুষ্ক ভদ্রতার ধন্যবাদ চাই নি। আজ সারাদিন আমি খুঁজে মরেছি একটু মনের ছোঁয়া, একটু প্রেমের ইসারা।

শুধু রক্তধুলো উড়ছে। পিক্‌নিক্ সাঙ্গ হ'ল। হাওয়ায় হাওয়াগাড়ি স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। প্রত্যাশার একটি দিন কেটে গেল। আমার আর একটি দিনের মৃত্যু হ'ল।

তুমি নিষ্ঠুর! তবু তোমাকেই আমি ভালবাসি। কিছু আমার বলবার নেই। বলবই বা কেন?

সূর্যমুখী দারুণ দহন সহ্য ক'রে তবু একলক্ষ্যে জলন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে। আমিও তেমনি অন্ধ সূর্যমুখী। তোমার ওই নিষ্ঠুরতাই আমি ভালবেসেছি।

একটি গল্প

সংসারের তীরে তীরে সহস্র যোজন লবণাক্ত সিন্ধু—সেই সিন্ধুকূলে অনেক, অনেক পিপাসিত আত্মা জন্মান্তের পিপাসা নিবৃত্ত করতে বসে থাকে—আমি তারই একজন। আমার গল্প শোন।

আত্মার পিপাসা? কথাটা হাস্যকর অবশ্যই, বিশেষতঃ আধুনিক জগতে। কিন্তু, আজ এই রজনীর নিভৃত যামে, বসন্তের কালশেষে, শোন, শোন তুমি, আমার আত্মা ছিল পিপাসিত।

ধনীর একমাত্র কন্যা আমি। পিতৃকুল, মাতৃকুল উভয় কুল অভিশপ্ত, উত্তরাধিকারী নেই—আছি আমি। আমি আছি আমার অনন্ত পিপাসা নিয়ে—আছি জীবনের বাঁকে বাঁকে তটের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষু!

মনে পড়ে সেই দিন। শ্রাবণ-অপরাহ্নের বর্ষণবিভোর ক্ষণে জীবনে আমার প্রথম আত্মচেতনা! বসবার ঘরে সকলে সমবেত! আমার সাথী মল্লিকার মাতা ত্রিনয়নী দেবী ঈর্ষার নিশ্বাস ফেলে আমার মাকে বলছেন—'লক্ষ্মীর ইস্কুল যাওয়া বন্ধ ক'রে দাও, দিদি। যা হাড়গোড় বার-করা ছিরি হচ্ছে! একেতেই তো রোগা হাড়গিলে, তার উপর ছিরি-ছাঁদ সব চলে গেলে লোকে যে ফিরেও চাইবে না। টাকার পাহাড় তোমাদের ভাই, তবু তো রূপ সকলেই চায়।'

আমি কুরূপা নই। আমার ক্ষীণ দেহে সুষমার অভাব ছিল না। দরিদ্র-কন্যা হ'লে লোকের মায়ার উদ্রেক হোত নিঃসন্দেহে। কিন্তু, আমার দিকে তাকানো মাত্র দর্শকের চক্ষে ভেসে আসতো—ভীরু কিশোরীর কোমল মুখচ্ছবি নয়—পিতামহ মাতামহের সঞ্চিত ঐশ্বর্যের স্তূপ। আমার নয়নের অসহায় ভঙ্গি কারুর দৃষ্টিগোচর হোত না, হোত আমার দামী গাড়ি, বন্দুকধারী দারোয়ান। আমার চুলের কুঞ্চনভঙ্গি চোখে পড়তো না, পড়তো আমাদের প্রাসাদ-ভবন, বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি, কয়লার খনি।

রৌপ্য রূপ আনে সত্য, আবার রূপকে আবরিতও করে তেমনি ভাবে। আমার মন চিরদিন কাঞ্চনের আড়ালে রয়ে যেত। সাধারণে আমার দিকে বিস্ময় সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাতো—সহানুভূতিতে নয়। আমার সহানুভূতির প্রয়োজন আছে, ভালবাসার প্রয়োজন আছে—কেউ বুঝতে চাইতো না।

কি নিঃসঙ্গ জীবন আমার! সহপাঠিনীদের বিদ্রূপ মনে পড়ে—'লক্ষ্মী, তুমি তো প্যাঁচায় বসে আছই, সরস্বতীর হাঁসে আর লোভ দিও না। কলেজে এসে লাভ কি তোমার, বল? তোমার কাছে কেউ লেখাপড়া চাইবে না। সেসব বলতো আমাদের জন্যে।'

মনে পড়ে আড়ালে দাস-দাসীর তাচ্ছিল্য, মনে পড়ে অসংখ্য প্রার্থীর অবিরত করপ্রসারণ আমার অর্থের প্রতি। পঞ্চদশ বৎসরের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে। বন্ধু সুচরিতার দাদা সুজিৎ আমার সঙ্গে আলাপে ব্যগ্র। বহু পূর্বেই আমার মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল, তবু সে কঠিনতার মধ্যেও কোমল পুষ্প-স্বপ্ন জেগে উঠলো তরুণ যুবকের মনোযোগে। তারপর? নিরালাতে সুজিতের প্রস্তাব—'লক্ষ্মী, তোমার বাবাকে একটু বলনা, তোমাদের কলিয়ারীর ম্যানেজারের পদটা খালি আছে। তুমি বললেই আমার হয়ে যাবে।'

প্লাবনের মত যে প্রেম মনের দ্বারে আঘাত করেছিল, সহসা তার উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে গেল। সুজিৎ আমাকে ভালবাসে নি, সে আমার সঙ্গে মিশেছে স্বার্থ-সিদ্ধির আশায়। বাবার কাছে অনুরোধ করেছিলাম, সুজিতের পদপ্রাপ্তির জন্যে নয়—বলেছিলাম—'বাবা, আমাদের টাকাকড়ি সমস্ত বিলিয়ে দিলে কি হয়? গরিব হ'য়ে গেলেই তো ভাল, না?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিতা আমার দিকে চেয়ে মর্মান্তিক অস্ত্র হানলেন—'গরিব হ'য়েগেলে ভালো আর কি?—তা হ'লে, তোমার তো কোন মূল্যই থাকবে না।'

আমি মূল্যবান আমার অর্থে—কিন্তু পর পর দুইটি আঘাত অসহ্য। কঠিন মনে জগতের প্রতি ঘৃণার প্রথম বীজ রোপিত হ'ল।

তারপর ধীরে ধীরে বয়সের সঙ্গে সে বীজ মহীরূহ হ'য়ে উঠলো যথাক্রমে। বুঝলাম, কেউ আমাকে ভালবাসে না, ঈর্ষা করে। বুঝলাম পুরুষ আমাকে দুই-ভাবে দেখে, হয় আমার অর্থের আশায় আমাকে চায়, নয় আমার অর্থ দেখে ভীত হ'য়ে পলায়ন করে। ভালবাসা পাবার উপায় আমার নেই।

কিন্তু, আমার পিপাসা তো এখানেই। প্রেম ভিন্ন আত্মা থাকে পিপাসিত।

বেদনার সিন্ধু লবণাক্ত—ভালবাসাই একমাত্র পিপাসা, শান্তি, তা সে স্নেহ, বাৎসল্য ভক্তি যে কোনও মূর্তি ধ'রেই আসুক না কেন। নিঃসঙ্গ জীবন আমার—পথে কোনও বন্ধু নেই। একজন বন্ধুর আশায় সমগ্র দিনরাত্রি উন্মুখ হয়ে থাকতো। যারা আমাকে মৌখিক সমাদর প্রদর্শন করতো, তাদেরকে চিনবার ক্ষমতা ছিল আমার, বন্ধু বলতে পারতাম না। পৃথিবীর কুশ্রী মুখের দিকটা শুধু আমার দিকে ফেরানো ছিল। ঘৃণায় শামুকের মত জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে আপনার মধ্যেই নিবদ্ধ ক'রে রাখতাম। সেই বঞ্চিত মানুষের কথা কেউই বুঝে দেখে নি।

যথাকালে পিতা বিবাহ স্থির করলেন। চমৎকার পাত্র। কিন্তু, হায়, যে চায় প্রেম, যে চায় বন্ধু, তাকে কি বিবাহের জালে ধরা চলে?

শুনলাম আশ্রিতাদের গুঞ্জনে—'আহা, পাত্তর কি আর সহজে মেলে? টাকা দিলেই তবে না পাওয়া যায়। টাকার লোভে বিয়ে করছে, সবাই জানে। ছেলের মত ছিল না, বাবা জোর ক'রে ধ'রে-বেঁধে দিচ্ছে।'

তখন বি. এ. পাশ করেছি। জীবন অসহ্য—প্রকাণ্ড গাড়ি চড়ে বেড়াই—প্রকাণ্ড বাড়িতে একা একা ঘুরি-ফিরি। বিদেশী পুস্তক পাঠে ভারাক্রান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা উদয় হোল: না, এ বিবাহ অসম্ভব। আমার নিজের কতটুকু মূল্য আছে, না জেনে সংসারে আমি প্রবেশ করবো না। আমার স্বামী চাই না, চাই হৃদয়ের নিঃসঙ্গতার সঙ্গী। তাকে আমিই একমাত্র খুঁজে নিতে পারি। আমি নিরুদ্দেশ হবো।

সুতরাং নাটকীয়ভাবে বিবাহের পূর্বে আমি নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলাম পিতাকে একখানি পত্র লিখে রেখে।

তারপর যবনিকার উত্থান মফস্বল সহরের ছোট স্কুল-বোর্ডিংএ। আমি কোটীপতির উত্তরাধিকারিণী লক্ষ্মী রায়চৌধুরী নই—আমি সেবা মিত্র। সহজ নাম, অতি সহজ পরিচয়—অনাথা স্কুলে কাজ ক'রে জীবন রক্ষা করে। কত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল এ উদ্দেশে, সে স্বতন্ত্র ইতিহাস। জীবনে মিথ্যা বলার প্রয়োজন হয় নি তাই আমার প্রথম মিথ্যা সকলের কাছে সত্য বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল।

বেশ আছি। সামান্য কিছু টাকা এনেছিলাম। মেয়ে পড়াই, ছোট বোর্ডিংএ থাকি। বোর্ডিংএ প্রথমে ঘর পাই নি, শিক্ষয়িত্রী সুরূপা চন্দ দয়া ক'রে নিজের ঘরের অর্ধেক দেওয়াতে বাসের ব্যবস্থা হয়েছিল।

সুরূপা আমার সমবয়সী, আমার কেউ নেই জেনে সহানুভূতি দেখায়! মনে মনে হাসি, কঠিন পরীক্ষায় পড়লে সুরূপা চন্দ, ভালমানুষীর মুখোস খসে যেতে কতক্ষণ? বারে বারে যে আমি মুখোস খোলা দেখেছি অসংখ্য বন্ধুদের মুখ থেকে। বন্ধুত্বে আমার বিশ্বাস নেই। আমার প্রকৃত পরিচয় জানলে সুরূপার স্বার্থবোধ জাগ্রত হ'য়ে উঠবে, আমার কাছ থেকে যতটা পাওয়া যায়, চাইবে সে। আমার তো কোনও বন্ধু নেই

দু'মাস কেটে যায়। ঐশ্বর্যের বিপরীত জীবনযাত্রায় কষ্ট হ'লেও নতুনত্বের খেয়ালে সয়ে থাকি। কতদিন পারবো জানি না। কাগজে কাগজে নিরুদ্দিষ্টার উদ্দেশে বিজ্ঞাপন দেখি, মাতা-পিতার কাকুতি-মিনতি দেখি। অবশেষে পুরস্কার ঘোষণা দেখলাম: আমার সন্ধান দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

বোর্ডিংএ একমাত্র সুরূপার সঙ্গে কথা বলি, একঘরে থাকি দুজনে। একমাত্র সে-ই পারবে অসতর্ক মুহূর্তে আমার কোনও পরিচয় জানতে।

পাঁচ হাজার টাকা সুরূপার কাছে অনেক টাকা। একসঙ্গে পাঁচশো টাকা দেখে নি ও। গরিবের মেয়ে ভালবাসে আরও গরিব ছেলেকে। বিয়ের জন্য টাকা জমাচ্ছে সুরূপা। পাঁচ হাজার টাকা পেলে ওর প্রতীক্ষার প্রয়োজন হবে না—এখনি বিবাহ করতে পারবে প্রেমাস্পদকে। এ লোভ সুরূপা সম্বরণ করতে পারবে না, জানি। সুরূপাকে লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলাম। কাগজের বিজ্ঞাপন যাতে ওর চোখে না পড়ে সে চেষ্টারও ত্রুটি রইলো না।

সুরূপার দূর সম্পর্কের ভাই সুদর্শন। স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক। মাঝে মাঝে দেখা হ'ত।

সুরূপা একদিন হাসি মুখে সংবাদ দিল—'সুদর্শনদার তোকে বড় ভাল লেগেছে রে, সেবা। বলিস তো সম্বন্ধ করি।' তাচ্ছিল্যে উত্তর দিলাম—'হঁ্যা! টাকা ছাড়া তো কিছু হয় না, জানই। আমার নেই চালচুলো, এমন হাঘরে পাত্রী নেবে কে?' সুরূপা বিষণ্ণভাবে উত্তর দিল—'সুদর্শনদা সে রকম নয়। তুমি লোক চেন না, সেবা তাই এমন কথা বলছো। তোমার কিছু নেই জেনেও উনি রাজী আছেন, ভাই।'

কৌতূহলে প্রশ্ন করলাম, 'আর যদি অনেক থাকতো আমার? তা হ'লে তোমার আদর্শ পুরুষ সুদর্শন কি না করতেন বলতো?'

'তার উত্তর তো আমার আদর্শ পুরুষ সুদর্শনদাই দিয়েছেন। বলেছেন,

'সেবার টাকা থাকলেও আসে যায় না, না থাকলেও আসে যায় না। আমি তাকেই ভালবাসি। সে মহারানী হ'লেও বাসবো, ভিখারিনী হ'লেও বাসবো।'

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম, 'স্বরূপা, বেশী বকো না। ভয় নেই, এখান থেকে যদি চলে যাই তোমার দাদাকে ঠিকানা দিতে ভুলবো না।' আমার বিদ্রূপ-হাস্যের মধ্যে স্বরূপার আবেদন নিঃশেষে ডুবে গেল।

কিন্তু, আর নয়। আমি বাঁচবার জন্যে পলিয়েছি, আবার পালিয়েই বাঁচতে চাই। বিদ্রূপ-হাসির আড়াল থেকে একটা সত্য বারবার ভেসে আসছে: সুদর্শনকে আমার ভাল লাগে। তার রূপ, তার প্রতিভা আমাকে আকর্ষণ করে অন্ধ আবেগে। সব থেকে আকর্ষণ তার নির্লোভ, উদার চরিত্র।

সে আমাকে ভালবাসে, এ তথ্যে আমার সুখ নেই। আমি জানি, আমার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পেলে সুদর্শনের রূপান্তর হবে। তাকে বিশ্বাস করতে পারি না। যদি একটিও প্রকৃত বন্ধু থাকতো, হয়তো তা হ'লে পারতাম। একজনকে বিশ্বাস করতে শিখলে সুদর্শনকেও বিশ্বাস করতে পারতাম। পারতাম তাকে ভালবেসে সুখী হতে।

কিন্তু, আর নয়। সে সুখ আমার জন্যে নয়। আমার পিপাসিত আত্মা ট্যাণ্টালাসের অভিশাপ বহন ক'রে ফিরবে। তবু, আমি পালাতে চাই। সুদর্শনের স্বরূপ আমি চোখ চেয়ে দেখতে পারব না। পঞ্চদশ বৎসরের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণে এল। সুজিৎ! সর্বস্ব দিতে উদ্গ্রীব হয়েছিলাম, সে চাইলো আমার ভৃত্যের বেতনভোগী পদমাত্র। বঞ্চিত মনের শান্তি কোথাও নেই। ফিরে যাবে নিজের আবেষ্টনে। ঐশ্বর্যের স্তূপে এবার সম্পূর্ণ নিজেকে প্রোথিত ক'রে সব ভুলে থাকবো। তবু, সুদর্শনকে ভালবাসবার ভুল করতে পারবো না।

কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললাম। কর্তৃপক্ষকে পদত্যাগ-পত্র পাঠালাম। সোনার পিঞ্জরে ফিরে যাক বিহগী। স্বাধীনতা সেখানে নেই সত্য, কিন্তু এখানের দাসত্বেও নেই। আর সুদর্শনকে যে আমার ভোলা চাই।

স্বরূপা আদর্শ-পুরুষ দাদার যতই প্রচার করুক, তিনি স্বরূপার রক্তের আত্মীয়, তাই। স্বরূপার মতই অর্থে আসক্তি। কিভাবে যে পয়সা জমায় স্বরূপা সমস্ত খরচ বাঁচিয়ে, দেখলে তবে বোঝা যায় কতটা টাকাকে ভালবাসে ও। বিয়ের জন্যে টাকা জমালেও সাইলক স্বরূপার সঙ্গে তুলনীয়।

স্বরূপা আমার উপকার করেছে। প্রথমতঃ আশ্রয়, দ্বিতীয়তঃ সঙ্গ দিয়েছে

ও। মুখে আদর দেখিয়েছে। ওকে কোনও উপহার দিয়ে যাবো। টাকা ভালবাসে ও—টাকাই দেবো।

বিষণ্ন সন্ধ্যায় স্বরূপা জানালার কাছে শুয়ে আছে একা সারাদিনের ক্লান্তির পরে। ঘরে প্রবেশ করলাম—সেবা মিত্র নয়—লক্ষ্মী রায়চৌধুরী। যে রকম পোষাকে অভ্যস্ত ছিলাম, সেই পোষাক দীর্ঘ তিন মাস পরে বাক্সের লুকান গহ্বর থেকে বার করে পরেছিলাম।

স্বরূপা ক্লান্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে বিস্মিত হ'ল,—'একি, সেবা এত সাজ যে? তুমি এমন ক'রে সাজতে পারো?'

'আমি সেবা নই। স্বরূপা, কাগজে লক্ষ্মী রায়চৌধুরী নিরুদ্দেশের কথা পড়েছ? তার সন্ধান দিলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে, জানো?'

'হ্যাঁ, কাগজে পড়েছিলাম।'

'স্বরূপা, আমি সেই লক্ষ্মী রায়চৌধুরী।'

স্বরূপা বিছানায় উঠে বসলো—'সেবা, আমি জানতাম তোমার মধ্যে কোনও রহস্য আছে। কেন পালিয়েছিলে তুমি?'

'আমার জীবনে সুখ ছিল না, তাই।'

সকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে স্বরূপা বললো, 'আহা! তা ওরা কি তোমার খোঁজ পেয়েছে? তোমাকে কি আবার পালাতে হবে, ভাই? তোমার টাকার দরকার হবে, না? শোন, আমার তিনশো টাকা জমেছে। তুমি নিয়ে যাও।'

স্বরূপাকে আমি পুরস্কারের টাকা দিয়ে কৃতার্থ ক'রে দেব ভেবেছিলাম! ভেবেছিলাম, আমি তার উপকার ক'রে যাবো। কিন্তু, স্বরূপা আমাকে তার দীর্ঘ দিনের দুঃখ-কষ্ট-সঞ্চিত যথাসর্বস্ব তারই আগে উপহার দিয়ে বসলো। তিন-শো টাকা স্বরূপার কাছে ঐশ্বর্য—তার বিবাহের সম্বল। আমি কে তাতে স্বরূপার কিছু আসে যায় না—পুরস্কারের টাকার কথা তার মনের কোণেও ছায়া ফেলে না। স্বরূপা সুদর্শনের বোন।

স্বরূপা ব্যস্তভাবে বললো, 'লক্ষ্মী তো তোমার আসল নাম। পালাতে চাও, এখনো সময় আছে। টাকাগুলো তুলে আনি? হয়তো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। গরীব বন্ধুর উপহার তোমাকে দুঃখের হাত থেকে বাঁচাক। নিশ্চয় কারণ আছে, নইলে নিজের মা-বাবাকে ছেড়ে পালাবে কেন? টাকা তুলে আনি।'

এই তো ! পিপাসিত জীবনের অনন্ত পিপাসা শান্তি—নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এই তো বঞ্চিত নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গী—প্রকৃত বন্ধু। পেয়েছি। আমার জীবনের পাথেয় আমি পেয়েছি। যে মানুষ এখনও দেবতা, তারই সন্ধান পেলাম। এক-জনকে বিশ্বাস করতে পেরেছি—সকলকেই এখন বিশ্বাস করতে পারবো।

উদ্যত সুরূপাকে হাতে ধ'রে নিবৃত্ত ক'রে সহজ কণ্ঠে বললাম, 'আমার দুঃখ কিছুই না, সুরূপা। পালানো খেয়াল মাত্র। একা একা থাকতে থাকতে মন বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিল। চিন্তার ধারা এক পথ ছাড়া চলতো না। তুমি আমাকে সুস্থ ক'রে তুললে—তোমাকে আর তো ছাড়ব না ভাই। আমি বুঝেছি আমার বাবা-মা আমাকে ভালবাসেন। অন্যায় করেছি। তাই আজই ফিরে যাবো। তবে চলো সুরূপা, যাবার আগে আমার কথা রেখে যাই। সুদর্শনকে ঠিকানা দিয়ে যাই, চলো।'

পৃথিবী, পৃথিবী ! তুমি কি সুন্দর ! কি সুন্দর তুমি !

নগরের নাম কলিকাতা

পার্ক স্ট্রীটে ঘনিয়েছে অন্ধকার। এখনও অগণিত নীয়ন-আলোর লোলুপ জিহ্বা অন্ধকারকে লেহন ক'রে নেয় নি। আলো জ্বলার পূর্ব মুহূর্ত।

অন্ধকার পার্ক স্ট্রীট থেকে এল চৌরঙ্গী। পরিধিবৃহৎ চৌরঙ্গী। যান-সমাকুলতায়ও ক্বচিৎ নির্জন। দুই ধারে বনেদী ইংরাজবাটী—স্বাধীনতা সমাগমে বিদেশী পলায়ন করেছে।

অমনি একখানা বাড়ি দেখা যায় বাসে ভবানীপুরের দিকে আসতে আসতে। হঠাৎ থমকে-দাঁড়ানো একটি মুহূর্ত যেন কালের অশ্বযুগলের। আবৃছা আলোয় ভুতুড়ে পরিবেশ। গাছে-ঢাকা ঘোরানো লোহার সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দায়, বারান্দা ঢুকে গেছে ঘরে।

অমন বাড়ির সম্মুখে এলে কি মনে হয় ? মনে হয় না এখানে অনেক কিছু ঘটেছে, অনেক কিছু ঘটতে পারে ?

শংকরের তাই মনে হয়েছিল। সেদিন অফিসে কাজ করতে করতে দেরী হয়ে গেল ওর। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা ঘনালো। সেই সিঁড়ির দিকে চেয়ে শংকর হঠাৎ যেন দেখতে পেল একটি শ্যামবর্ণা তন্বী মেয়ে ম্লানমুখে নামছে।

কাউকে যেন খুঁজে না পেয়ে ফিরছে ও ক্লান্তপ্রত্যাশায়। কাটা-পিঙল চুলগুলো ওর বাতাসে দুলছে।

তাইতো! মনে পড়ে গেল, শেলী এখানে আসতো না? সে তো অনেকদিন আগের কথা। ও এতদিন চলে গেছে! এত বয়স হয়েছে শংকরের? শংকরের আকাশ থেকে এতগুলো তারা খসে গেছে?

বাড়ি ফিরে স্মৃতি আরও উত্তাল হয়ে উঠল। সান্ধ্য আকাশে বঙ্কিম চন্দ্রকলা। কলিকাতার গরম বাতাস এখন সমুদ্র-স্নাত গঙ্গাসাগরের বাতাস। নিরালা ক্ষণে একটি পুরাতন কাহিনী মনে পড়ে শংকরের।

নগরের নাম কলিকাতা। মদালসা বারনারীর মত বহু বণিককে সে আশ্রয় দেয়। অর্থের ইঙ্গিতে আসে তারা এখানে। সারা ভারতবর্ষ থেকে আসে দলে দলে লোক।

পার্ক স্ট্রীটে আলো জ্বলে, চৌরঙ্গীতে আলো জ্বলে। দোকান খোলা হয়। ব্যস্ত জনতা বিচরণ করে। কী বিভিন্ন ভাষা তাদের! তাদের পোষাকে নানা বৈচিত্র্য। সম্পদে ভোগে বিহ্বল সন্ধ্যা সেখানে। অবশ্যই দেশে প্রাচুর্য আছে।

কিন্তু, রাত্রির কাল বাদুড়পাখা ইসারা করে দূরে। দর্শকের আত্মা ঊর্ধ্বে প্রয়াণ করে। কি ক'রে সম্ভব? একই দেশে দুই প্রত্যন্ত প্রদেশ! নারী-পুরুষ অসহায় অবস্থায় বাস করছে বাসস্থান নামধেয় আবর্জনার কুণ্ডে। জন্ম-মৃত্যু ওখানেই নিয়মিত চিহ্নিত হয় দারিদ্র্যের পঙ্কগহ্বরে। সেখানে চিররাত্রি। এ কোন্ নগর?

নগরের নাম কলিকাতা। এ সেই প্রাচীন ভারতবর্ষীয় যুগের রাজধানী নয় —বিভিন্ন জাতির পণ্যক্ষেত্র মাত্র। দূরের পথিক আসে। পৃথিবীর শেষ-প্রান্তে ভ্রাম্যমান ভারতীয়েরা এখানে তল্পা নামায়। নগরের নিজের কোন রং নেই।

তবু, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনক্ষেত্র এখানে। অস্তিমশায়ী পশ্চিম-নক্ষত্র দূরে স্তিমিত জ্যোতি এখনও বিকীরণ করছে। নবোদিতা পূর্ব-তারকা দ্বিধ ম্লান এখনও। শাসন-ক্ষমতার হস্তান্তর ইতিহাসের অন্যান্য দেশের মত এখানেও বিভ্রম এনেছে। এখানে আজ বহু পথিকের পদচিহ্ন পড়ে।

ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা স্রষ্টার কাব্য মনে আসে—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে
সমুদ্রে হলো হারা।
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।"

শতাব্দীর ঘুম চমকে উঠেছে, ভেঙ্গেছে নগর-বিদেশীর পদধ্বনিতে। ভারতবর্ষের মধ্যমাণিক্য কলিকাতা।

হাসি পায়! রবীন্দ্রনাথ, এই মানুষের ধারা যে কি নিয়ে এসেছে, তুমি দেখে নিতে পার নি। তোমার কবিহৃদয় যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তার সাফল্য দেখলে তুমি ব্যথাই পেতে। যুদ্ধ আর স্বাধীনতা! সমগ্র নগরের বুকে বিদেশের জনস্রোতের তাণ্ডব। ভারত বিভাগ। সারা দেশের হত্যা আর দাঙ্গার রক্তসিক্ত রেফিউজি আসছে কলিকাতায়। এখানে প্রসারিত কর প্রসারণ ক'রে আরও আসছে মানুষের লোভ। বাণিজ্যে-পণ্যে মোহিনী কলিকাতা, বারবিলাসিনী। পলাতকার আশ্রয়।

বিদেশী যে এসেছে এখানে, সে জয় করতে চেয়েছে। সে চায় নি ভালবাসা, দিতে পারে নি সে ভালবাসা। সে চেয়েছে ভোগের বস্তু। বিদেশীর দর্প আর দেশীয়ের ভুলবোঝা, এরই মধ্য দিয়ে যে আর এক নতুন অভিযানের ইতিহাস গড়ে উঠেছে! অসহনীয় দুঃখে হয়তো নতুন ভাষায় এক মহাকাব্য রচিত হয়। তারপরে, অনেক দূরে একই চাঁদ ওঠে সকলের মাথার ওপরে। একই বাতাসে অশ্রুত কণ্ঠে ভাসে: ঈশ্বর, আর কতকাল আমরা প্রতীক্ষা ক'রে থাকবো? তোমার অন্ধকারের রাজত্ব আজও কি শেষ হয় নি?'

অনেকদিন আগে এক মানুষীর আত্মা হয়ত এমনি ক'রেই প্রার্থনা করেছিল রাত্রির আকাশের নিচে। রাত্রির কিংখাব যবনিকা দুলছে মহানগরীর মুখের ওপর। কিন্তু, নিষ্ঠুর নাগরিকাকে একটুও কোমল করতে পারে নি। ইঁট ও কংক্রীট-গাঁথা সৌধ, তার মধ্যে মানুষ আছে, মন নেই। যে বিদেশী লোভ

নিয়ে এসেছে, সে শুধু লোভই পেয়েছে। তৈমুর-বাবরের রক্ত দিগ্বিজয়ের নেশায় এখানে তাদের ডেকে এনেছে—ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র এই মহানগরে। সারা ভারতবর্ষের সর্বনাশের ছায়া এখানেই পড়ে।

এমনি ক'রেই ভেবেছিল সেদিন সেই মানুষী। সে তো বোঝে নি ভিন্ন প্রদেশের ধমনীতে কি শক্তি কাজ করে। নিজের কথাও সে বোঝাতে পারে নি। শুধু শীর্ণদেহ তার হয়েছিল শীর্ণতর, অশুভ ছায়ার মত তার দেহে নেমেছিল শ্যামছায়া।

ইংরাজ আমলের ঐতিহ্য বুকে নিয়ে শেলীর জন্ম। বাবা ছিলেন পদস্থ রাজ-কর্মচারী, মনে-প্রাণে বিদেশীর অনুরাগী। মেয়ের মনে সেই বীজ উপ্ত ক'রে দিয়ে তিনি অকালেই বিদায় নিলেন।

মানুষ হ'তে লাগল মামার বাড়িতে—সেখানেও দেখল বিদেশী-প্রীতি। পাশের বাড়িতে এম-এ ক্লাশের ছাত্র শংকর হ'ল তার বন্ধু।

'চুলগুলো কেটে ফেলেছ কেন শেলী? বাঙ্গালীর মেয়েকে কি কাটাচুলে মানায়?' শংকর বলত।

'খুব মানায়। চিরকাল যে-ভাবে সাজ ক'রে এসেছে তারা, আমরা কি আজও তাই করব? তা হ'লে নোলক পরে মল বাজিয়ে বেড়াই না কেন?'

সেই শেলী! অঙ্গে কোনদিন ওর ঢাকাই বা একখানা শান্তিপুরী দেখে নি শংকর। সাগরপারের রেশম দুর্মূল্য, তাই বোম্বের বস্ত্র ধারণ করেছিল শেলী। তবু বাঙলার কিছু নয়। এক অদ্ভুত মনোবৃত্তি ওকে অবাঙালী বস্তুর দিকে টেনে নিত।

সেদিন শংকর বুঝতে পারে নি। তারপরে দু'চারবার যখনই শেলীর কথা ভেবেছে, তখন কি অদ্ভুত তার মনোবৃত্তি বোধগম্য হয়েছে নিঃসন্দেহে। অজানার মোহ, অপরিচিতের আকর্ষণ। অপরিণত মন শেলীর। পিতার সঙ্গে জীবনের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, স্মৃতি তো আছে শেলীর মনে। ফিরিয়ে আনতে চায় শেলী সেই স্বর্ণযুগকে। সুতরাং অভূতপূর্ব কিছু করা প্রয়োজন। চারপাশের লোক বড় সাধারণ। তাদের থেকে পৃথক কিছু চাই, নিজের গণ্ডির বাইরে হাত বাড়াও।

বন্ধুর পার্টি থেকে ফিরে শেলী জানাল, 'জানো শংকর, আজ একজন নতুন ধরণের লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল।'

পঞ্চনদ-প্রদেশের একটি তরুণ; এখানে এসেছে আশ্রয় নিতে। এই কলিকাতার বুকে তার ব্যবসায় খুলেছে সে। বাঙালীর সঙ্গে আলাপ তার কেবল সময়ক্ষেপের জন্য নয়, প্রয়োজনও।

শেলীর সঙ্গে আলাপ ঘনতর হ'ল ক্রমে ক্রমে। শেলী তার স্টুডিওতে ছবি তুলতে গেল। ওই,—চৌরঙ্গীর ওই ভুতুড়ে বাড়িখানায় থাকত বিদেশী ছেলেটি। পাশেই তার ফোটোগ্রাফির দোকান ছিল।

বিদেশী নয়, ভারতবর্ষেরই সন্তান, তবু কত পার্থক্য? শংকরের সঙ্গে আলাপও হল প্রেমকুমারের। সোনালী চুল, শাদা চামড়া, লাল ঠোঁট। ইংরাজী ভাষায় শপথকণ্টকিত ফিরিঙ্গিয়ানায় সে মন ভোলাল বাঙলার মেয়ের?

শুধু কি চাল-চলন? পৌরুষতেজোদীপ্ত কঠিন তার দেহ—বসন্তের কামনাস্নিগ্ধ নিঃশ্বাস যেন। প্রতিটি ভঙ্গিতে তার পরিপূর্ণতার প্রতিশ্রুতি। নিজের কাল-কেলো কমনীয় দেহকান্তি ধ্বংসের নখরে বিলুপ্ত করতে বাসনা হয়েছিল সেদিন শংকরের।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসেই ফিরত শংকর। একদিন রাস্তায় অনিবার্য নানা বিপৎপাতের একটির হেতু গাড়ি মধ্যপথে বেপঠীতে আটকে গিয়েছিল। চোখ তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখল শংকর—ওই সিঁড়ি, ওই বাড়ি। আর সেই সিঁড়ি বেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে নেমে আসছে শেলী একা।

শংকরের প্রশ্নের উত্তরে শেলী প্রথমটা মিথ্যা বলতে চেষ্টা করল, 'প্রেমের কাছে আমার একটা ছবির নেগেটিভ্ আনতে গিয়েছিলাম।'

শ্যামাভ মুখে তার ভীত অসহায়তা—ধরাপড়ার ভয়। বড় মায়া হয়েছিল শংকরের। শেলীর সত্যভাষণ শংকরের পক্ষে অশুভ। তবু জেদ চেপে গেল শংকরের। পদ্মাপারের বাঙালের গোঁ।

'নেগেটিভ নিতে বাড়ি কেন? স্টুডিওতে গেলেই পারতে।'

শেলী ঢোঁক গিলে বলল, 'বাড়িতে এনেই রাখবার কথা ছিল কি না!'

'মিথ্যা বোল না, শেলী। কলেজের বইখাতা হাতে একা একা গিয়েছিলে তুমি। নিশ্চয় কলেজ পালিয়ে গিয়েছিলে, যাতে কেউ না জানে। কি বেহায়া! কতদিন ধ'রে যাতায়াত চলেছে, শুনি?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার? মামাকে লাগাবে বুঝি?' শেলীর কাল রঙে লাল আমেজ লাগল। খাটো চুলগুলো নেচে উঠল।

শংকর মর্মান্তিক কণ্ঠে বলল, 'মামাকে লাগাবো না। আমিই তোমার সঙ্গ ছাড়বো। একটা বিদেশী পাঞ্জাবী! বাঙালী মেয়ের কলংক তুমি, শেলী। বল, সত্যি বল, কতদূর গেছ? লজ্জাও নেই?'

'না নেই, নেই। সত্যি কথাই বলছি, শোন। শেষ পর্যন্ত গিয়েছি, যতদূর যাওয়া চলে। আমি প্রেমকে ভালবাসি। হ'ল তো?' শেলীর তর্জন সারা ঘরে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। তার সঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে গেল শংকরের সমস্ত সত্তা—সমস্ত শংকর।

তারপর, গঙ্গার জলে অনেক জোয়ার বয়ে গেল। অনেক রাত্রির তারা খসে পড়ল। অনেক দিন ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে ধূলোয় উড়ল।

বুঝল শংকর, শেলীকে সে কত ভালবাসে। শেলী ভিন্ন তার জীবনে দ্বিতীয়া নারী আসতে পারে না।

সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে বিদেশী জনতা-সমুদ্র। এসেছে নানা দস্যু; নানা বণিক। ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তারা সম্পদ—ছিনিয়ে নিয়ে গেছে নারী। বাংলার নগর কলিকাতা আজ হয়েছে সংস্কৃতি। তাই চোখ মেলে দেখতে হল শংকরকে, তার প্রিয়তমাকে নিয়ে গেল পঞ্চনদ।

শংকর হ'ল দেশত্যাগী। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। একটা বৃত্তি যোগাড় ক'রে সমুদ্রপারে চলে গেল। সেখানে তার প্রতিজ্ঞা ছিল, শেলীর নাম করবে না। সে প্রতিজ্ঞা শংকর রক্ষা করতে পেরেছিল।

ফিরে এসে চাকরীর সন্ধানে ভ্রাম্যমান শংকরের দেখা হ'ল শেলীর বন্ধু মীনাক্ষির সঙ্গে। মীনাক্ষি স্বতঃপ্রবৃত্ত খবরদাতা হ'ল।

না, শেলীর সমাধি পঞ্চনদে হয় নি, এখানেই। যে জাতি-ধর্ম প্রদেশ-বৈষম্য দু'জনকে এক করেছিল, আকর্ষণে, সেটাই শেষে বিষম হয়ে দাঁড়াল। প্রেম-কুমার রূপের তেজে, যৌবনের দীপ্তিতে ভোগের ক্ষণস্বর্গ দিল শেলীকে। দেখাল সে বাঙালীর থেকে প্রেমিক হিসাবে কত যোগ্যতর। কিন্তু নরম বাংলার মেয়ে যে আঁকড়ে ধরতে চায়, চায় সে সত্যকারের বস্তু। উগ্র বিজাতীয় রক্তের ধারা সে বোঝে না। ক্ষণস্বর্গ কাম্য নয় তার, মাটির ঘর সে গড়তে ভালবাসে।

নতুনত্বের মোহ চলে গেলে থাকে শুধু অবসাদ। মোহগ্রস্ত পঞ্চনদকে আত্ম-বিস্মৃতা বাংলা যদি প্রথমেই বিবাহ ক'রে ফেলত, তা হ'লে এতদিনে ডাইভোর্স-

কোর্টে শেষ হত সে মামলা। কিন্তু, বাংলার সাহস ছিল না মামার ভয়ে। সে অপেক্ষা করতে বলেছিল। প্রতীক্ষা সহ্য হ'ল না, নেশা ঝিমিয়ে এল রক্তে। পঞ্চনদের তো ধৃতি নেই। বিবাহ হ'ল না। শেলী হ'ল অসহ্য উৎপাত মাত্র।

বাড়ি গেলে দেখা হয় না—প্রেম থাকে না। নানা অজুহাতে দূরে সরে থাকে। বাড়িতে জানাজানি হয়ে অশান্তির উপক্রমে হঠাৎ একদিন ব্যবসায় গুটিয়ে প্রেমকুমার প্রস্থান করল শেলীকে না বলে।

সেই ঘোরানো সিঁড়ি। শেলী কতবার ফিরে এসেছে ম্লান মুখে প্রেমিককে না পেয়ে। শীর্ণা—উদ্বিগ্না শেলী।

তারপরে শেলীর কি হ'ল, জানে না মীনাক্ষি। শেলী সিনেমায় নামবে বলে চলে গিয়েছিল। ভ্রষ্টার শেষ পথ।

কোথায় আছে শেলী? এখনই শংকরকে দরকার তার। সারা পৃথিবী তোলপাড় ক'রে তাকে খুঁজে বেড়াবে শংকর? যদি শেলীকে পায়, তবেই শংকর সংসারী হবে। সমুদ্রের জোয়ারে জেগে উঠল অপরূপ একটি কামনা। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বাংলার সভ্যতা আবার হাত বাড়াল অতীতে স্বকীয় মহত্বের দিকে। বিদেশীর যে নতুন অভিযান এই নগরের বুক চিরে-চিরে লেখা হচ্ছে, সব কিছু ধ্বংস করতে সেই অভিযান কৃতসংকল্প। ঘুমন্ত বাংলার আত্মা জেগে উঠল।

চিন্তার মধ্যে শুভ্র একখানি হাত কফির কাপ বাড়িয়ে ধরল, 'বা বাঃ, আর পারিনে! উপযুক্ত লোকজন না হ'লে সংসার চালানো দায়। তোমার আবার চা চলে না। কফি আমাকেই বানাতে হয় রোজ রোজ।'

না, শেলী নয়। শংকরের গৃহিণী। কয়েক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে শংকর এর কুমারীত্বের ভার ঘুচিয়েছে।

হাঁ, শেলীর খোঁজ তো পেয়েছিল শংকর। দূরে নয়—এই নগরীতেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শেলী যোগ দিয়েছে। সিনেমায় স্থান পায় নি। নাচের দলে সে মঞ্চে নামে। শংকর টিকিট কেটে বসেছিল সেখানে।

রুদ্ধশ্বাসে নাচের দলের প্রতীক্ষা করছে শংকর। কে কি অভিনয়ে কথা বলছে, শ্রুতি-বহির্গত তার। প্রতীক্ষার উপরে রক্ত-কিংখাপের যবনিকা উঠল।

প্রাসাদে সখীর দল রাজকুমারীর বিবাহোৎসবে নৃত্য করছে। উদয়শংকরী

কারুময় নৃত্য নয়। প্রাচীন থিয়েটারের কাঠের তক্তার ধুলিধূসর যাত্রা-নৃত্যের পুনরুত্থান মাত্র। দ্বিতীয় সারির শেষ নর্তকী শেলী।

স্বল্প-বর্ণাঢ্য, প্রসাধন শিল্পের চতুর নমুনা সেই মুখ নয়। সস্তা থিয়েটারের গ্রীজ-পেইণ্ট্‌। অতি নির্লজ্জ ভঙ্গিতে শেলী নাচছে। স্বাস্থ্যহীন দেহ তার এবারে কাজে লেগেছে দ্রুত ভঙ্গিবিন্যাসে।

রং-মাখা মুখে কোন জীবন নেই। হতাশায় মগ্ন সেই মুখ। কিন্তু সারা চিত্ত শংকরের শিউরে উঠল। সে মুখে লাস্য-মাদকতা ফোটাবার চেষ্টা করছে শেলী। কি বীভৎস! কলিকাতার আত্মা শেলীর। নীয়ন-আলো জ্বেলে ভয়াবহ কুশ্রীকে চাপা দেওয়া!

একটি অঙ্গুলি প্রসারণ ক'রে শেলীকে উদ্ধার করা যায়। হাত বাড়াবে শংকর এইবার।

প্রোগ্রামখানা দিয়ে মুখ আড়াল ক'রে বসেছে শংকর। যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ শংকরশূন্য হ'ল। অসহায়কে অনুকম্পা করা চলে। বীভৎসকে দয়াও হয় না।

নগরীর বক্ষে অগণিত জনতা ভ্রষ্ট করেছে নগরকে। বহু মানুষের ধারা এনেছে বহু আবর্জনা। বিভিন্ন প্রদেশ লুব্ধ হাত বাড়িয়ে এসেছে এখানে বণিকের মন নিয়ে। বাংলার সভ্যতাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিয়েছে তারা। নগরের এই নতুন ইতিহাস এখনও কেউ রচনা করে নি।

এ নগরে প্রেম, করুণা, ক্ষমা নিঃশেষে ইঁট ও কংক্রীটের মধ্যে মিলিয়ে যায়। আজ এ নগরে কেবল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে-চলার প্রতিযোগিতা। মিশ্র সভ্যতার নির্মম নাগরিকতা ফিরেও দেখে না, কে পিছিয়ে রইল, কার প্রার্থনা আকাশ পেল না।

নগরের নাম কলিকাতা।

আজ কেন জানি না পূর্বস্মৃতি বড় বেশী, বেশী মনে পড়ছে। সামান্য একজন মেয়ে ছিল সে। কিন্তু একদা অসামান্য রূপেই আমার চোখে প্রতীয়মান হয়েছিল রমা। বহুদিন পরে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আবার।

একটু ভীরু লজ্জিত ভাবে সে বা'র হয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস থেকে। যেন চতুর্দিকের জনপ্রবাহের সঙ্গে কোন যোগ নেই তার।

সামনে যেয়ে দাঁড়ালাম—, 'এখানে কোথায় এসেছিলেন?' 'ও, উষা তুমি।' আমার পরিচিতা চমকিত হয়ে দাঁড়ালেন। 'আমি তো এখানে ইংরেজিতে এম. এ. পড়ছি। আপনি, রমাদি?'

'আমি পড়তে চাই সংস্কৃতে। সেইসব তদ্বির করতে এখানে এসেছিলাম।'

'কবে কলকাতায় এসেছেন? খবর দেন নি যে বড়? এতদিন পড়াই বা বন্ধ করেছিলেন কেন?'

'সে অনেক কথা।' রমা অভ্যস্ত চকিতহরিণী দৃষ্টিতে চারপাশ চেয়ে দেখল একবার। অজস্র জনসমাগমে কোথাও অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগ নেই। রমার বিব্রত ভাব লক্ষ্য ক'রে বললাম, 'আচ্ছা, কাল এখানে আসবেন তো?'

সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে জানালাম, 'কাল আসব তা হ'লে। তিনতলায় মেয়েদের বসবার ঘরে দেখা হবে আপনার সঙ্গে। কেমন?'

বাড়ি ফিরে বারে বারে রমার কথা মনে পড়ছে আমার। সবে তখন প্রবেশিকা দিয়েছি, আলাপ হয় রমার সঙ্গে। সে সেবার পশ্চিম থেকে এসে উঠেছে মামার বাড়ি আই. এ. পরীক্ষা দিতে। আমাদের সঙ্গে দূর একটা সম্পর্ক থাকায় আলাপ করতে এসেছিল আমাদের বাড়ি।

ফাল্গুনের সেই মধুর সন্ধ্যাটি! আকাশে তরল-হাল্কা অন্ধকার ঘিরে আসছে। দুই একটি উজ্জ্বল তারা দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যার শীতল বাতাসে আমাদের সিঁড়ির উপরের চাতালে কে যেন বসে আছে—দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে। আমার পরীক্ষা সেইদিন শেষ হ'ল। মনটা মুক্তির আনন্দে অধীর হয়েছিল, সুতরাং নবাগত অতিথির আগমন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করলাম।

ছয় বছর আগের কথা, তবু মনে আছে স্পষ্ট। রমার দীর্ঘ দেহকে বেষ্টন

করেছিল লালপাড় গরদ। রমার রূপ ছিল না। তাকে ভাল দেখতে নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, দেখায় ভাল। দীর্ঘ দেহ, মেয়েদের পক্ষে হাড় বেশী চওড়া। চোখ দুটি আকর্ণ ও ভাবময়। নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র, মুখের ডৌল কমনীয়। চিক-চিকে রং, সবল গঠন। কেন জানি না, প্রথম দৃষ্টিতে ভাল লেগে গেল অত্যন্ত।

তারপর আসন্ন গোধূলির সেই স্তিমিত বর্ণচ্ছটাকে বিস্মিত ক'রে তার কণ্ঠে অপরূপ গীতধ্বনি বেজে উঠল :—

'শুধু দু'দিনেরি খেলা।
ঘুম না ভাঙিতে, আঁখি না মেলিতে
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।'

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সমস্ত মন সাড়া দিয়ে উঠল গানে গানে। বয়সের, শিক্ষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সখ্য হয়ে গেল রমার সঙ্গে।

এতদিন পরে আবার দেখা হ'ল। কারণ একবছর কলকাতায় থাকবার পরেই সে পশ্চিমে চলে গিয়েছিল। আমার মনে হয় রমা আমার পূর্ব সৌভাগ্য ফিরিয়ে নিয়ে আসছে! সে ফিরিয়ে আনবে আমার অনাবিল হাস্যমুখর দিনগুলি, যখন সমস্ত আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল প্রেমের রাগে, বাতাস ব্যগ্র হয়েছিল প্রেমের বন্দনায়। ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। ছয়মাস আগে অজিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সতেরো বছর বয়সে বিবাহ স্থির হয়ে যায়। তারপর? এই দেড়বছর আগে নিউইয়র্ক থেকে অজিতের চিঠি বিবাহ ভেঙ্গে দিয়েছে। আমার পরিজনমহলে গুজব, অজিত ওখানেই মার্কিণ-মহিলার পাণিগ্রহণ করেছে। কারুর কোন কথায় সেদিন যোগ দেই নি, আজও দিই না। কোন নিরালা নিস্তব্ধ রাত্রে যখন অকারণে চোখে ঘুম আসে না, তখন নিজের মনে হয়তো একবার বলি, 'অজিত, তুমি কি ক'রে এত নিষ্ঠুর হ'লে?'

আমার আত্মীয়-স্বজন সম্প্রতি আমার বিবাহের চেষ্টা করছেন, জানি। আমি শেষ পর্যন্ত নির্বাক হয়ে থাকব কি না বলতে পারি না। বলতে পারি না, বিক্ষিপ্ত জীবনের গতি যাবে কোন পথে। বলতে পারি না, সারাজীবন যখন কোন চোখে ঘুম আসবে না, আমার মন তখনও কি প্রশ্ন করতে ভুলে যাবে, 'অজিত তুমি কি ক'রে এত নিষ্ঠুর হ'লে?'

অজিতের সঙ্গে যখন আলাপ, এবং যখন সে আলাপ প্রেমে পর্যবসিত তখন রমা আমার বন্ধু ছিল। তখন প্রায়ই রমা আসত। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে

শীতলপাটি পেতে ছাদে বসতাম দু'জনে। টবের রজনীগন্ধা গন্ধ বিতরণ করত, দু'একটা বেলী খসে পড়ত। খসে-পড়া সাদা ফুলের মত আকাশে তারা উঠত ইতস্তত ছড়িয়ে। আবছায়া চাঁদের আলো রমার ভাবময় মুখের ওপর, প্রশান্ত ললাটের ওপর, কাল চুলের ওপর ঝিকমিক করে উঠত। আমার প্রেমমগ্ন মন সেই সন্ধ্যার প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যেত প্রিয় বান্ধবীর আলাপনের রসে। আমার মুগ্ধ নয়নের সম্মুখে কত সুদূর মধুর দিনের ছায়াছবি ভাসত। পৃথিবীর সব কিছু তখন সুন্দর লাগত। চিত্তের দ্বার খোলা ছিল বিশ্বকে মিতালীর আহ্বানে। খোলা দ্বার দিয়ে রমা সোজা আমার মনে প্রবেশ করল।

রমার সঙ্গে আমি কিন্তু অজিতের আলোচনা কিছু করতাম না। রাশিয়ার যুগসমস্যা, এলিয়েটের দুঃসাহসিকতা, রবীন্দ্রনাথের মাধুর্য—এসব নৈর্ব্যক্তিক বিষয় আমাদের আলোচ্য ছিল। গোধূলির সোনার আলোয় বসে যখন শরৎসাহিত্যে পতিতার স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করতাম তখন আমার কানের পাশে অজিতের বুদ্ধিপ্রদীপ্ত কণ্ঠস্বর অহরহ বেজে উঠত। স্বদেশ-প্রেরণা মানুষকে কত আত্মত্যাগে প্রবুদ্ধ করতে পারে, প্রহর ধ'রে আলোচনা ক'রে যেতাম আমি। যদিও মনে জেগে থাকত অজিতের হাস্যচপল চোখ দুটি। রমা হয়তো বলে যেত আমি শুনতাম, কিন্তু অজিত যেন আমার পায়েই দাঁড়িয়ে থাকত। আমার মুখের উত্তর-প্রত্যুত্তর যেন অজিত শুনতে পেত। আমার হৃদয় এত পূর্ণ ছিল যে পূর্ণতা উজ্জ্বল হয়ে হৃদয়কে আন্দোলিত করত না, একটি নিবিড় পরিপূর্ণতায় বিলীন হয়ে থাকত।

সে জগৎ—আজ আমার হারিয়ে গেছে। কেন জগৎ আবৃত ক'রে আছে আমার আকাশস্পর্শী অভিমান? কখন সে অভিমানে বলে উঠে—'কেন তুমি এরকম বারে বারে নিজেকে বঞ্চিত করছ? অজিত তোমার কে? কেন তার জন্যে এ আকুলতা?'

অজিতকে ভুলতে হবে। আড়ম্বর ক'রে আমার ভোলা সুরু হ'ল। যে যে শাড়ীগুলি বিশেষ বিশেষ দিনকে মনে করিয়ে দেয়, তাদের অন্যান্য কাপড় চোপড়ের অন্তরালে নির্বাসন দেওয়া হ'ল। অজিতের উপহার বার্ণসের কবিতাবলি উপরের লাইব্রেরীর বই-এর গাদায় রেখে আসা হ'ল। অজিতের কথা জোর ক'রে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতাম। কতক্ষণ আমার এ সাধনা অব্যাহত রইল? সন্ধ্যাটা কাটল ভাল। একটু আত্মপ্রসাদ এল। কিন্তু, আবার কেন সারা আকাশ মথিত ক'রে বর্ষাধারা নেমে এল? আমার কি দোষ? আমি তো ভুলেই ছিলাম।

কেন শান্ত রাত্রিকে উদ্দাম বর্ষা চঞ্চল ক'রে তুলল? কেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে অকারণে চোখে ঘুম এল না। আবার মন জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, 'যে যাকে ভালবাসে সে তাকে পায় না কেন?'

এতদিন পরে রমাকে পেয়ে মনে হ'ল সে যেন আবার আমার সুখ, সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে ফিরে আসছে। আবার এই বসন্ত দিনে সে ফিরে এসেছে আমার বিগত বসন্তকে ফিরিয়ে আনতে।

দেখা হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুক্ষণ অনাসক্ত ভাবে উভয়ে আলাপ ক'রে গেলাম। রবিবার সন্ধ্যায় আমার কাছে আসবে বলে রমা উঠল।

আবার সন্ধ্যায় সেই ছাদ। সেই শীতলতপাটি দুই একটি শিথিল বেলফুল। আবার চাঁদের আলো রমার কাল চুলে।

রমা আমার অনুরোধে একটা গান ধরল, অনুরোধ করলাম পুরাতন গানটাই গাইতে। সেই 'শুধু দুদিনের খেলা।' কিন্তু সে গানে আজ আমার প্রাণে সাড়া কই? সেই চিরপরিচিত কণ্ঠ, সেই সান্ধ্য পরিবেশ। কিন্তু, একখানা শীতলপাটি, দুটো বেলফুল, খানিকটা দক্ষিণাবাতাস, চাঁদের আলো, পুরণো দিনের গান এনে ফেলতে পারলেই কি পুরণো দিনকে ফিরে পাওয়া যায়?

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম রমার দিকে। আশ্চর্য! কি ক'রে একে অসামান্যা ভেবেছিলাম? কাঁধের হাড়গুলো কি চওড়া, দেহ দীর্ঘ, পুরুষের মত! মুখের চোয়াল চৌকো—বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে। চোখদুটো ড্যাব্-ড্যাব্ করছে, ম্লান —শ্রীহীন মূর্তি, দেখতে একে ভাল লাগত কেমন ক'রে?

এই তো সেই গান? এই তো সেই রমা? সেই তো আমি! সেই তো পরিবেশ!

তবু, কেন সুর লাগছে না আমার মনে, সুর লাগছে না আমার জীবনে?

কি ক'রে লাগবে। আমার বন্ধু পুরণো রমা নেই কোথাও। সেদিন যাকে এত বিশেষ মনে হয়েছিল, আজ সে হ'ল সাধারণ? কি পরিবর্তন?

হঠাৎ সত্যের রূপ ভেসে এল মনে। পরিবর্তন রমার হয় নি, হয়েছে আমার নিজের। আমি নিজে সে উষা নেই আর।

প্রেম একদিন আমাকে সামান্যর মধ্যে অসামান্য দেখতে শিখিয়েছিল! প্রেমের ধর্ম যে তাই। সামান্যা রমাকে অসামান্যা মনে হয়েছিল সেই চোখের লক্ষ্যে। টাইটেনিয়ার প্রমাদ ঘটেছিল আমার। মোহান্তে সাধারণকে সাধাণই মনে হ'ল।

ও, তাই, তাই! তাই অজিতকে আজ ভুলতে পারছি না? মনে হয়েছিল সেও অসামান্য। গাধাকে রূপকুমার বলে ভ্রম করেছিলাম। আজও অপদার্থ, চপলমতি হৃদয়হীনকে ভুলুতে পারছি না। যে নিষ্ঠুর হয়েছে, তার সে নিষ্ঠুরতার উপাদান তো তারই মধ্যে ছিল। আমি দেখি নি কেন?

রমা সত্যই আমার সুখ নিয়ে এল। ফিরে দিল সে আমার জ্ঞানবুদ্ধি। তাকে দেখে, তার যথার্থ রূপ দেখে বুঝলাম আমি অজিতের যথার্থ রূপ। সে ছিল অতি সাধারণ, একনিষ্ঠ প্রেমের উপযুক্ত নয়। ভুল করেছিলাম কেন?

আবার আমার মন প্রশ্ন ক'রে উঠল প্রাচীন জিজ্ঞাসা-প্রথায়। কিন্তু, আজ তার জিজ্ঞাসা ভিন্ন :—কেন সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে নারীর জীবন এত পরমুখাপেক্ষী? কেন সামান্য প্রেমের উর্ধে, বহু উর্ধে সে প্রেমের মুক্তি নেই?

যৌতুক

ঐশ্বর্যমুখর ধনীগৃহে দ্বিপ্রহর রাত্রি কাটিয়ে এসেছিলাম অন্তরঙ্গ বন্ধুর বিবাহোৎসবে। কিন্তু আজ সেই স্মৃতির আলোচনায় কেবলি মনে হচ্ছে, সত্যিই কি আমি দীপ্তির প্রকৃত বন্ধু ছিলাম? তা হ'লে কেমন ক'রে সে আমার কাছ থেকে জীবনের এত বড় অধ্যায়টি লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল?

দীপ্তির সঙ্গে বহুদিন একত্রে পাঠ গ্রহণ করেছি। উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছি। দীপ্তি থাকতো স্নেহময় ধনী পিতার গৃহে প্রসাধন ও সামাজিকতার চর্চা নিয়ে। ক্রমে ক্রমে অবশ্য দীপ্তির সঙ্গে পরিচয়ের প্রগাঢ়তা কমে আসছিল, সহসা নিমন্ত্রণ পেলাম।

পূর্বেই জনশ্রুতিতে জেনেছিলাম, দীপ্তি বিয়ে করছে এক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে, রূপযৌবন ভিন্ন যাঁর সবই আছে। বিস্মিত হয়েছিলাম একটু, কারণ পুরুষের ও দুটি বস্তুর ওপর দীপ্তির তীব্র আকর্ষণ ছিল।

কৌতূহলী হয়ে টেলিফোনযোগে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি নিজেই বলছ দেখতে ভাল নয়, বয়স বেশি। তবু কেন তাঁকে বিয়ে করছ?'

তীক্ষ্নহাসির সঙ্গে অপর দিক থেকে উত্তর এল, 'টাকার জন্যে, নামের জন্যে।'

বিবাহগৃহে উৎসববাতি জ্বলে উঠেছে। আদরিণী কন্যার বিবাহে দীপ্তির পিতা কোনদিকে কার্পণ্য করেন নি।

দীপ্তিকে আমরা রানীর সাজে সাজাচ্ছিলাম। তার মর্মরশুভ্র গাত্রবর্ণে রক্তগোলাপবর্ণ বসন ও হীরক অলংকার আলোর নিচে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দীপ্তির হাতে হীরা, গলায় হীরা, কালচুলে সোনালী ওড়না, অধরে তীব্র হাসি, নীলাভ নয়নে বিষাদ।

'কেন ওর মুখ ম্লান?'—বার বার আমার মন নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, 'পরিজনকে ছেড়ে যাবে বলে? না, বেশি দূরে তো যেতে হবে না। শোভন রায় পাঁচ মাইল দূরে থাকেন মাত্র। তা ছাড়া, ওর মনে এসব দুর্বল মমতা নেই বলেই তো জানি।'

'কেন জ্বালাতন করছ, মৃণ্ময়ী?' দীপ্তি আমার হাত থেকে রঞ্জনী ছুঁড়ে ফেলে দিল,—'অত সাজায় না!'

কেন ও বিরক্ত হচ্ছে? এ তো শ্রান্তি নয়, এ যে বিরক্তি। দীপ্তির ছোট বোন তৃপ্তি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিল। কতকগুলো উপহারদ্রব্য হাতে সে এখন ঘরে প্রবেশ করল—'দিদি, এই নাও তোমার চিঠি, এই নাও বাক্স। তোমার হাতে হাতে দেবার হুকুম আছে। মৃণ্ময়ীদি, দিদিকে দাওতো ভাই।'

লাল মখমলে শায়িত একটি বুকে পরবার ব্রুচ, লাল চুনীর হৃদয়রতনে শাদা হীরার তীর বিঁধেছে। নিষ্করুণ তীরবিদ্ধ আরক্ত হৃদয়। তীরে গাঁথা একপাতা চিঠি। যাঁর নাম স্বাক্ষরিত, দীপ্তির বাড়িতে তাঁকে বহুদিন দেখেছি।

ছোট চিঠি, বাক্স খোলা মাত্র পড়া হয়ে গেল। একবার দীপ্তির মুখের দিকে তাকালাম। তারপরে মুখ ফিরিয়ে গহনার বাক্সে ভেলভেটের কেসটি রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিঠি?'

অবরুদ্ধ কণ্ঠে দীপ্তি বলল, 'আমার কাছে দাও।'

পরিষ্কার চিঠি, সহজ ভাষা। লেখক কিছু গোপন রাখেন নি। মনে হ'ল অন্তরে এমন সর্বরিক্ত বেশ ধ'রে বাইরে দীপ্তির টিশুশাড়ী ও হীরের গহনার আড়ম্বর বিড়ম্বনা মাত্র।

কিছু বোঝার বাকী ছিল না। তবু যদি জানতাম আমারই চোখের সম্মুখে একটি দৃশ্য অভিনীত হবে তা হ'লে হয়তো অতরাত্রি পর্যন্ত ওখানে থাকতাম না।

রাত্রি দশটা বেজে গেল, লগ্ন বারটায়। নারী অতিথির দল কমে গেছে।

দীপ্তি পেছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চাঁদের আলো তখন তার সর্বাঙ্গের রত্ন-আবরণে জ্বলে উঠেছে।

ও ক্রমেই বিষণ্ণ হচ্ছে। ওর মনে আজ বাইরের উৎসব স্পর্শ করছে না!

ক্রমে ক্রমে দুই একটি বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বান্ধবী ব্যতীত দীপ্তির মধ্যরাত্রির বিবাহে কোন সাক্ষী রইল না। খোলা আকাশের নিচে একলা দাঁড়ালাম আমি আর এই অন্তরভারাতুরা মেয়েটি, ঘণ্টাখানেক বাদে যার বিবাহাসনে বসতে হবে।

কেন ও কাঁদছে না? ওর মুখ যে কান্নার চেয়েও করুণ!

দীপ্তি সানাইয়ে আশাবরী ফরমাস করল। মনে পড়ে গেল আমার, পত্রপ্রেরক স্বরথের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন দীপ্তি গান গেয়েছিল আশাবরীতে। স্বরথও উত্তর দিয়েছিল আশাবরীতেই।

তৃপ্তি এক পাত্র শরবৎ হাতে ছুটে এল, 'একটু শরবৎ খাও দিদি, এখনও তো দেরী আছে।'

'নিয়ে যা শরবৎ, ফেলে দে'—দীপ্তির করাঘাতে কাঁচের গ্লাস চুরমার হয়ে গেল। যে চাঁদের আলো দীপ্তির হীরক-ভূষণে এতক্ষণ প্রতিফলিত হচ্ছিল, তুচ্ছ টুক্‌রো কাঁচের উপরেও সে লুটিয়ে পড়ল। সেইদিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ আশ্চর্য নরম স্বরে দীপ্ত বলল, 'একবার স্বরথদাকে ডেকে আনতে পারিস, তৃপ্তি?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সভয়ে তৃপ্তি চলে গেল জনারণ্যে স্বরথের সন্ধানে। আমি একটু দূরে সরে দাঁড়ালাম।

চারিপাশে অসংখ্য অট্টালিকার উপর ক্ষীণ চাঁদের আলো পড়ে যেন একটি অস্পষ্ট স্বপ্নজগৎ রচনা করেছে। সানাইয়ে করুণ আশাবরী, বারান্দার নিচে বরযাত্রীদের হাস্যকল্লোল, আর বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দীপ্তি—তার হাতে হীরা, গলায় হীরা, মনে বেদনা।

কেন ও এমন করছে? যাকে জীবনে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে যাচ্ছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে আঁকড়ে রাখার কেন এ প্রচেষ্টা? কি বোকা ও!

নিজের মনে নানাকথা নাড়াচাড়া করছিলাম। হঠাৎ দেখি হলঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসছে স্বরথ। আজ তার কান্তরূপ শ্রীহীন।

'দীপ্তি, আমি বাড়ি যাচ্ছি—' ধরা গলায় স্বরথ বলল।

'না, তুমি যাবে না—' দীপ্তি হলঘরের মধ্যে প্রবেশ করল, 'তুমি আজ এখানেই থাকবে, থাকতে হবে।'

দীপ্তির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্য থেকে ভেসে এল। বারান্দায়, যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম একা।—'তোমার দেখতে হবে দাঁড়িয়ে, চোখ মেলে। তুচ্ছ জাতের বাধা আমি মানতে চাই নি, তুমি—তুমি তো রাজী হ'লে না। এখন পালাও কেন? দাঁড়াও, দেখ ভাল ক'রে।'

নির্বাক স্বরথ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সজ্জিত শূন্য ঘরের মধ্যে সজ্জিতা সুন্দরী দীপ্তি একা দাঁড়িয়ে রইল। মুখ-তার পাথরের মত কঠিন, সমস্ত জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা তার নীলাভ চোখে।

পরের দিন যখন দীপ্তির বাড়ি পৌঁছলাম তখন বিদায়ের করুণ সানাই বাজছে, শঙ্খধ্বনিতে গৃহতল মুখরিত। শোভন রায়ের রোলস্ মার্বেল-সিঁড়ির সামনে অপেক্ষা করছে।

কার্পেট-মণ্ডিত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে দীপ্তি, পরিধানে টিশুর রক্ত-গোলাপীবর্ণ শাড়ি, সর্বাঙ্গে হীরা ঝলসিত। অঞ্চলে বাঁধা নবপরিণীত স্বামী শোভন রায়ের সূক্ষ্ম চীনাংশুক থেকে ভেসে আসছে ফরাসী পুষ্পসারের গন্ধ, যার প্রতিটি বিন্দুর দাম একটি রজতমুদ্রা।

দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদছে তৃপ্তি, গোলাপী শিফন্ তার অশ্রু কলংকিত। বাঙালীর কন্যার পতিগৃহে যাত্রা। আত্মীয়স্বজনেরা মমতা প্রকাশ করছেন, বন্ধুরা সিল্কের রুমালে নয়ন অবারিত করেছে। সারি দিয়ে ভৃত্য ও পরিচারকেরা চোখ মুছছে দাঁড়িয়ে।

বেদনার এই সবিশেষ প্রকাশের মধ্যে দীপ্তির চোখে জল নেই। পাথরের মত কঠিন মুখ তার, যেন অশ্রুও পাথর হয়ে গেছে। অবিচলিত পদে সে উঠে গাড়িতে বসল, একবার ফিরেও তাকাল না কারুর দিকে। সকলের ওপর যেন সে একটা কিছু শোধ তুলছে।

কেন ওর চোখে জল নেই? সবাইকে ছেড়ে পরের ঘরে জন্মের মত চলে যেতেও কি কষ্ট হয় না!—আমার মন প্রশ্ন করল। নিজেই উত্তর পেলাম, 'কঠিন আঘাত' ওর সব অশ্রু নিয়ে চলে গেছে, ছোট ব্যথার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখে নি।

আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি ফিরে একবার পাশের বাড়ি যেতে হ'ল।

প্রতিবেশিনী ছোট মেয়েটির কাল রাত্রে বিবাহ হয়ে গিয়েছে। বিধবা মায়ের মধ্যমা কন্যা। নিকষ কাল গাত্রবর্ণ তার, সতেরো বছর বয়স। এই বয়সের ভারেই সে সংকুচিত হয়ে উঠেছিল। সদর দরজার বাইরে তাকে ভীরু কাল চোখ দুটি ভিন্ন কিছুই দেখবার উপায় ছিল না। বাড়িতে কেউ বেড়াতে গেলেও সযত্নে নিজেকে সকলের আড়ালে লুকিয়ে রাখত উমা।

বিধবার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, খুঁজে দেবারও লোক নেই। বিয়ে হ'ল তাঁর মেয়ের প্রথম পক্ষের ছেলের সঙ্গেই। পাত্র দেখতে চলনসই, মনোহারী দোকান আছে একটি।

বাইরের ঘরে নতুন বরকে দেখে অন্দরে গেলাম। একখানা আর্টসিল্কের শাড়ি পরে শীতলপাটির উপর উমা বসে আছে। কপালে চন্দনলেখা, লিপ্‌স্টিকের বদলে অধরে তাম্বুলরাগ। হাতে তিনগাছি চুলের মত সরু চুড়ি; গলায় একটি স্থতোর মত সরু হার, কানে একজোড়া ক্ষুদ্রতম ইয়ারিং। সামনে বউদি বসে তালপাখায় বাতাস করছে। এই বউদির উমার সঙ্গে বিশেষ বনিবনা ছিল না বলেই জানতাম। আজ পরগৃহে ননদ চলে যাবার মুহূর্তে বউদি মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে কাছে সরে এসেছে! চক্ষে সিফনের অঞ্চল তুলে শোক করার সময় বা স্থযোগ নেই তার। তাই তুচ্ছ পাখার বাতাসে ব্যথাতুর মনটি নীরবে ঢেলে দিচ্ছে এই বধূ।

উমার মুখে পরম প্রশান্তি। সতেরো বছর সে যেন মা ও ভাইদের গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল। আজ করুণায় যে ব্যক্তি তাকে তুলে নিচ্ছে সে মনোহারী দোকান করে কি কাউন্সিলে বক্তৃতা দেয় সে বিচারের প্রয়োজন বা অধিকার নেই তার। সঙ্কীর্ণ রান্নাঘরে বসে মুখরা মাতার মুখনাড়া থেকে যে আজ তাকে মুক্তি দিল, যার জন্যে এই সামান্য কয়েকটি অলংকার, লাল সিল্কের শাড়ি জীবনে প্রথম তার অঙ্গে উঠল, যার আগমনে তাকে একটি উৎসবের কেন্দ্র করা হয়েছে, সে তো উমার চক্ষে দেবতা। সে দেবতা দেবে উমাকে নিজের গৃহ, পরিজনদের চক্ষে মর্যাদা। নারীজন্ম যে স্বামীরূপে সার্থক করেছে সে যে পঞ্চান্ন বছরের দোজবর নয়, তাতেই উমা কৃতার্থ। আকাঙ্ক্ষা ছিল না তার, তাই সে সুখী।

উমার মা মলিন মুখে আমার কাছে বসে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন, 'বড় অভদ্দর কুটুম হয়েছে, মা। বলে কি না, চুড়ি তিনগাছার বদলে বারগাছা ক'রে দিতে। আমার কি সেই ক্ষমতা? কোন জিনিস পছন্দ হয় নি। ঘড়ি দিতে পারি নি,

একটা ঘড়ি চেয়েছিল। বোঝে না আমি দেব কোথা থেকে! আংটিটাও ফেরৎ দিয়েছে। এক্ষুনি আমাকে বরের ভাই দশকথা শুনিয়ে অপমান ক'রে গেল। সবই আমার কপাল! কি জানি, এখন মেয়েটার সঙ্গে কি ব্যবহার করে!'

উমার সম্মুখেই এইসব কথা হওয়াতে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উমার দিকে তাকালাম। কিন্তু সে মুখে কোন ভাব-বৈলক্ষ্যণ দেখতে পেলাম না। উমা চকিতে একবার মায়ের দিকে চোখ নামাল। অপমান, অত্যাচার সবই সে ন্যায্য প্রাপ্য বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তার স্বামী যদি না তাকে পরিত্যাগ ক'রে আর একটি নতুন বিয়ে ক'রে ফলে তা হ'লেই তার অভিযোগের কিছু থাকবে না

সানাই নেই, তাই বাজল না। ভাড়া-করা ট্যাক্সিচালক তাগাদা দিতে লাগল। উমার বড়দি রোরুদ্যমান সন্তানকে নিয়ে বিব্রত। যাবার সময়ে একবার দরজায় দাঁড়াল মাত্র। সকলেরই ব্যস্ততা, কোন রকমে মেয়ে বিদায় দিয়ে যে যার কাজে লাগতে পারলে যেন বাঁচে।

উমা চলে গেল, কেউ কাঁদল না, কাঁদবার কথা কারও মনে এল না। উমার মা কুটুম্বের ফেরৎ দেওয়া জিনিসগুলো গোছাতে গোছাতে একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মাত্র। পরক্ষণেই সচকিত হয়ে ডেকে উঠলেন, 'ও বউমা, উনুনে দুধ চাপানো রয়েছে যে, নাবিয়ে ফেল! পুড়ে গেল কি না কে জানে।'

বৌমা বরণের ডালা মেঝেতে ফেলে রান্নাঘরে ছুটলেন। একদিনে আরও একটি মেয়ের বিদায়-যাত্রা আমারই চোখের সামনে হয়ে গেল।

উমা পরের ঘরে চলে গেল। তার সামান্য যৌতুকাদি একখানা ট্যাক্সিতেই কুলিয়ে গেল; দীপ্তির লেগেছিল একাধিক লরী। কিন্তু তবু উমার নিঃসম্বল বিধবা মা জামাতাকে যে যৌতুক দিলেন, দীপ্তির লক্ষপতি পিতা কন্যার সঙ্গে সেটি দিতে পারেন নি। উমা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল বিশ্বস্ত হৃদয়টি, অন্তর নিয়ে খেলায় যে সর্বসান্ত হয়ে যায় নি। টিশু শাড়ি ও হীরক-ভূষণ গৃহ-নির্মাণের প্রকৃষ্ট মাল-মসলা নয়।

সলিল বলিতেছে—আবার তোমাকে দেখিলাম। ধরিত্রী, তুমি জানো না আমি অন্তরাল হইতে তোমাকে দেখিতেছিলাম। তোমার ছোটবোনের বিবাহ, প্রশস্ত মর্মর-সোপানে তুমি দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিতা মহিলাদের অভ্যর্থনা করিতেছিলে। সবুজ পোষাকের সহিত কণ্ঠে কর্ণে তোমার মরকত—ঈর্ষার রং কেন শুভদিনে পরিয়াছ? ধরিত্রী, তোমার মুখ মলিন, তুমি শ্রান্ত।

তুমি শ্রান্ত? কেন? বিগতদিনে কখনও তোমাকে ম্লান দেখি নাই। আমার তরল ভাবপ্রবণ কবিতার কারুণ্যও একদিন তোমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। গিরিনির্ঝরের মুক্তগতিতে হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে ছিল তোমার গতি। লঘু চাঞ্চল্য তোমার বিশেষত্ব, চিন্তা কখনও তাহাতে রেখাপাত করে নাই। আজ প্রখর আলোকে বিবাহ-সভায় তোমার মুখ ম্লান কেন? টেনিসেনের মত প্রেমিকের ভাষা আমার কণ্ঠে ফিরিয়া আসিল—

'When will the dancers leave her alone?

She is weary of dance and play.'

অম্বরের কথা—

তোমার বঙ্কিম অধরে রঞ্জনীর লঘু প্রলেপ, আয়ত নয়ন-প্রান্ত ভ্রূ-তুলিকায় দীর্ঘাকৃত। তোমার কপালে আজ রক্ত-গোলাপ অনায়াসেই বিকশিত। স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সৌভাগ্যবতী তুমি, গায়ত্রীর বিবাহে অভ্যাগতদের আদর-আমন্ত্রণ করিতেছ। পাহাড়ীদেশে বিবাহিত জীবন যাপন করিবার ফলে তোমার গৌরবর্ণে শ্বেত-গেলাপদ্যুতি। আজ উগ্র আধুনিকা তুমি। বহুমূল্য আবরণে ও আভরণে তুমি সাজিয়াছ। আনন্দে তুমি উদ্দীপ্তা। তোমাকে চেনা এখন আমারও পক্ষে দুষ্কর।

কৃত্রিম, যান্ত্রিক হাস্যে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলে,—'হ্যালো, এই যে অম্বর! একেবারে wedding guest হয়ে এলে? এসেই কিন্তু মাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছি।'

ধরিত্রী! মুহূর্তের সানাইয়ের মধুকাকলী, জনকোলাহল আমার নিকট হইতে মিলাইয়া গেল। ফিরিয়া গেলাম লুপ্তপ্রায় অতীতে, বহুদূরে অপসৃত কোন এক

ক্ষুদ্র গৃহের অন্ধকার পরিবেষ্টনে। তখন তোমার সীমান্ত সিন্দুরশূন্য ছিল, মন আই-সি-এস পতিগর্বে পূর্ণ ছিল না। মনে পড়িয়া গেল স্তিমিত মোমবাতির আলোতে তোমার আত্মবিস্মৃত অপরূপ মুখচ্ছবি। আমাদের সেই 'সিঁয়াসের' ঘরখানি—তুমি তখন 'মিডিয়াম' হইতে প্রায় প্রত্যহ। কম্পমান বাতির আলো অন্ধকার গৃহের অপরদিকের দেওয়ালে তোমার ছায়া ফেলিয়াছে দীর্ঘ করিয়া। নিস্তব্ধ গৃহে বিজলীপাখার মৃদু শব্দ, তোমার প্রেতগ্রস্ত অঙ্গুলির 'বোর্ডের' উপর অসংলগ্ন বিচরণ। শেষের দিনটি মনে পড়ে। তাহার পরেই তোমার বিবাহ হইয়া গেল।

কি একটি ভাষায় সেদিন তোমার হস্ত হইতে লেখা বাহির হইয়াছিল, মনে আছে? আমাদের বিভিন্ন ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত ভাস্কর অবনত হইয়া সাশ্চর্যে বলিল, 'একি, এ যে ল্যাটিন! Ave, Imperator, morituri te saluatant! এর মানে হচ্ছে—হে সম্রাট, মৃত্যুপথযাত্রীরা তোমাকে অভিবাদন করছে। কি আশ্চর্য!'

তোমার মা অর্ধ চীৎকারে বলিয়া উঠিলেন—'কিন্তু, ধরিত্রী তো ল্যাটিন জানে না!'

সেই অন্ধকার গৃহে, অদেহীজনের উপস্থিতি-স্পন্দিত অন্ধকার গৃহে আমাদের কল্পচোখের সম্মুখে একটি ভয়াবহ দৃশ্য যেন অভিনীত হইয়া গেল। রোমের 'আরীনা,' পৈশাচিক মূর্তি রোমান সম্রাট ঊর্ধ্বাসনে সমাসীন। বন্যজন্তুসঙ্কুল আরীনার নিরস্ত্র গ্ল্যাডিয়েটর দল হস্ত উত্থিত করিয়া ভীতিকম্পিত কণ্ঠে বলিতেছে —'সম্রাট, সম্রাট, মৃত্যুপথযাত্রীর অভিবাদন গ্রহণ করো।'

তুমি সত্যই লিখিয়াছিলে। ধরিত্রী, আজ তুমি মৃত।

এবার অনিল বলিতেছে—

এত শান্ত কেন? যেন জীবনে বড় কিছু লাভ করিয়া তাহারই প্রাপ্তিসুখে বিভোর। এই তো তোমার হৃদয়-বল্লভ? শ্যালিকার বিবাহেও যাহার বস্ত্রাগারে স্বদেশী পোষাক পাওয়া যায় না! ও তোমাকে কি দিতে পারিয়াছে, কি দিতে পারিবে?

ধরিত্রী! ধরিত্রী! আমার সহস্র চুম্বন-স্মৃতি কখনও কি তোমার অধরে জ্বালাময় দহন আনে না? আমার ব্যাকুল বাহুবন্ধনের আরামও তুমি আজ ভুলিয়া গিয়াছ? প্রশান্তি তো তোমার রূপ নয় ধরিত্রী! আমার সামান্য স্পর্শেই

উদ্বেল সাগরের মত তুমি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে। সূর্যের উত্তাপ ছিল তোমার শোণিতে। আমি ভিন্ন কে তোমাকে শান্তি দিতে পারিল? ভুলিয়া গিয়াছ? ভুলিয় যাও? আমারও অন্যত্র আশ্রয় মিলিয়াছে।

এখন পৃথ্বীশের কথা—

শুনিলাম তুমি পরিবেশনকারীদের ডাকিয়া বলিতেছ, 'ভেট্‌কী মাছটা কম আছে। মেয়েদের দিকে ওটা দেওয়া আপনারা বন্ধ করুন।' দার্শনিক মন তোমার, বহু আলাপ-আলোচনা আমার সহিত করিয়া যাইতে। সেগুলি মনে রাখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

সমালোচকের মন তোমার, পৃথিবীর সমস্ত কিছুর পশ্চাতে চাহিয়া অন্বেষণ করিতে ব্যগ্র হইত। কোন বস্তুর সহজ সাধারণ রূপে তোমার তৃপ্তি ছিল না, যেন চরম রূপটি তোমার কাছ হইতে সকলে লুকাইয়া রাখিয়াছে। তোমাকে তাই এক খণ্ড 'The Adventures of the Black Girl in her search for God' উপহার দিয়াছিলাম। আজ অবশ্যই তোমার মনে নাই।

সেই তুমি ধরিত্রী। একদিন প্রাতঃকালীন চায়ের আসরে আমাকে বলিয়াছিলে, 'আচ্ছা পৃথ্বী, নেমতন্ন বাড়িতে মেয়েদের সঙ্গে লোকে এমন দুর্ব্যবহার করে কেন বলতে পারো? তারা তো বিনা নেমতন্নে যায় না?'

সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'কী ব্যবহারটা শুনি?' খনা-লীলবতীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গাম্ভীর্যে তুমি বলিয়াছিলে,—'দেখনা, কোন পদ কম পড়ে গেলে সকলের আগে মেয়েদের দিকে দেওয়া বন্ধ করে। তা ছাড়া জানি দুই একটা জিনিস কম ক'রে করা হয় মেয়েদের দেওয়া হবে না বলে। আর দেখ, বসবার জায়গা দেয় যেখানে সেখানে, এগলির মধ্যে, ওগলির মধ্যে, ওচৌবাচ্চার পেছনে। অথচ মেয়েদের আগ্রহ নেমতন্নে পুরুষদের চেয়ে কত বেশী! ছেলেরা তো কোন-মতে এক-একটা সাদা জামা-কাপড় পরেই সেরে দেয়। আর মেয়েরা শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, কতগুলো গয়না, জমকালো শাড়ি প'রে সাজগোজ ক'রে যায়। তার ওপর, ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নেমতন্নে যাবার সময়ে মেয়েদের কি শাস্তিই হয়? তবু, বেচারীরা কত আনন্দ ক'রে যায়। কিন্তু, বিশ্রী ব্যবহার পায় ওরা!'

একটু থামিয়া আমার উপর সন্ধানী দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন করিলে, 'কেন পৃথ্বী?'

প্রগাঢ় গাম্ভীর্যের অন্তরালে যেন ঈষৎ বিদ্রূপ-দীপ্তি ও কিঞ্চিৎ ন্যাকামী দেখিয়াছিলাম। মনে নাই।

সেই তুমি ধরিত্রী, আজ গৃহিণীপনার গর্বে বিস্ফারিত হইয়া নিজের পূর্ব মতামত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ। আজ বুঝি তোমার জগতে প্রেম—ভালবাসার মত অসার বস্তু কিছু নাই—আছে শুধু টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব।
ভাস্কর শেষ কথা বলিতেছে—

বিবাহের সভায় তোমার দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য মিলিল। তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ। দেখিলাম তোমার চক্ষে আমার জন্য অসীম করুণা, অনন্ত ভালবাসা। দীর্ঘ বিচ্ছেদ তোমাকে পরিবর্তিত করিয়াছে। তুমি প্রস্তরমূর্তি ছিলে, তোমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তোমার জীবন, বিবাহ করিয়া তুমি সংহত হইয়াছ। হয়তো স্বামীকে ভালবাসিয়া অপরের ভালবাসার মূল্য তুমি বুঝিতে শিখিয়াছ। হয়তো বিবাহ তোমার আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছে।

'হয়তো!' ইহা ভিন্ন আর আমি কি বলিতে পারি? যে মূর্তি তোমার পূর্বে দেখিয়াছিলাম এবং যে মূর্তি তোমার আজ দেখিতেছি, তাহা তোমার স্বকীয় মূর্তি কি না বলিতে পারিব না। জান, আজ এখানে অনেকে উপস্থিত আছে, যাহারা তোমাকে ভালবাসিয়াছিল তাহারা কেহই তোমার প্রকৃত পরিচয় হয়তো পায় নাই। হয়তো এখনও তাহারা যাহা দেখিতেছে তাহা তোমার স্বরূপ নহে। বিভিন্ন রূপে তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছ। জানি না, আমিও তোমার স্বকীয়তার সন্ধান পাইয়াছি কি না। তোমার নিজ মূর্তি কেহই দেখে নাই। কারণ ধরিত্রী, তোমার বা কাহারও নিজ মূর্তি একান্তই তাহার নিজস্ব। কেহই তাহা সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না। অন্যের সম্মুখে উন্মোচিত করিয়া তুমি তাহার মূল্য হ্রাস করো নাই। রহস্যময়ী ধরিত্রীর মতই তুমি চিরদিন প্রেমের ধরাছোঁয়ার বাহিরে আছ। সেই তোমার পরিচয়।

সিগারেটের ছাই

অকাল বর্ষণ। সুতরাং গৃহকোণে বসে পূর্বস্মৃতি কণ্ডূয়ণ। কালক্ষেপের এমন প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের বাংলা সাহিত্যের পাতায় পাতায় বিক্ষিপ্ত।

সন্ধ্যার আমেজে মন কেমন স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে! উদাস মনে পাণ্ডবীর বসবার ঘরে গোল বৈঠক বসিয়েছি আমরা কয়েকজন বন্ধু একখানা অতিকায়

গোল টেবিল ঘিরে। পাণ্ডবী কথা কম বলে, কিন্তু অন্যকে কথা বলিয়ে নিতে জানে।

পাণ্ডবী বলল, 'স্মৃতির কি কোন মূল্য আছে?'

এ আবার কোন্ ধরণের কথা? স্মৃতির মূল্য আছে বলেই তো বিশ্ব আজও বেঁচে আছে। আমি সম্প্রতি তাজমহল দেখে এসেছি। উষ্মার সঙ্গে বলে উঠলাম, 'স্মৃতির মূল্য নেই মানে?'

'আহা, চটো কেন? স্মৃতির মূল্য নেই তো বলি নি। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি, সেই মূল্য কতটা স্থায়ী?'

অতঃপর একটি সুদীর্ঘ আলোচনা প্রবাহিত হ'ল ভিন্ন ভিন্ন খাতে। বাদল-সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠল। অচলা আধ্যাপিকা মানুষ, তার কণ্ঠই উচ্চতম গ্রামে শোনা গেল। কত সাহান্সা, কত মহারাজের অমর প্রেম-কাহিনীর লিপি উদ্ধার ক'রে সে শোনাল। কত স্মৃতির পাদপীঠতলে কত মানুষের নীরব আত্মাহুতির বর্ণনা পেলাম আমরা।

মাধবী শোনাল শিল্পীর জীবনী। দেখাল নিজেকে। একজনের আশায় জীবনে সে একাকিত্ব বরণ ক'রে নিয়েছে।

আমি জানালাম জীবনে একমাত্র অমরত্ব—স্মৃতি। যত অমরত্ব এই প্রসঙ্গে দেখেছি পাণ্ডবীকে শোনালাম সরবে। পাণ্ডবী চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে মৃদু হাস্যে আমাদের কাহিনী শুনে গেল।

বহুক্ষণ কথাবার্তার পরে পাণ্ডবী মৌনতা ভঙ্গ করল। 'এবার আমার পালা, প্রশ্নটা যখন তুলেছি আমি, শেষ মত বা কাস্টিং ভোটের অধিকার আমাকে অবশ্যই তোমরা দেবে।'

'বল বল। আমরা শুনতে চাই, তোমার কি বক্তব্য আছে।' আমরা সাগ্রহে বলে উঠলাম।

'আমি মতামত বা যুক্তি দিয়ে শেষ করব না। আমি একটা গল্প বলব। এমন বর্ষার দিনে একটা গল্প ভালই লাগবে, কি বল?'

আমরা ঘন হয়ে বসলাম। বাইরে ধারাপাতের ঝম্ ঝম্ শব্দে গল্পের আব-হাওয়া মোহন হয়ে উঠল। গম্ভীর নিচু গলায় পাণ্ডবী গল্পটি বলে গেল।

'অনেকদিন আগেকার কথা। একটি মেয়েকে আমি চিনতাম। মেয়েটি ছিল একটু চুপচাপ—গভীরতা-ধর্মী বলা চলে।'

'যথানিয়মে কৈশোরে একজন কিশোরের প্রেমে পড়ল সে। প্রতিবেশী কিশোর। দীর্ঘদিন সাহচর্য পেল।'

'তারপর একদিন বিবাহের কথা উঠল। দেখা গেল, বাধা। দেখা গেল আকাশ-কুসুম আকাশে ফোটানো চলে, মাটির গাছে ফুল ধরাতে হ'লে চাই জল বাতাসের সহায়তা। প্রেম অবাধ; পরিণয় প্রহরায় থাকে।

'রজত-কৌলিন্য নেই তরুণের। অতএব তার তরুণী প্রেমিকার পানিগ্রহণে অধিকার পেল না সে। অভিমানী প্রেমিক দূর-দেশে চলে গেল। বলে গেল উপযুক্ত হয়ে ফিরে সে আসবে।'

পাণ্ডবী একটুক্ষণ চুপ করল একটানা বিবৃতির পর। আমি বলে উঠলাম, 'প্রেমিক স্মৃতি নিয়ে রইল প্রতীক্ষায়? শেষ পর্যন্ত মিলন হ'ল না। প্রেমিক তাকে ভুলে গেল অথবা ফিরে এল না প্রাণ নিয়ে। এই তো তোমার গল্পেরশেষ, না পাণ্ডবী?'

'না তো!'

'তবে কি? তুমিই বল? আমাদের বেশীক্ষণ বসিয়ে রেখ না একটা মনস্তত্ত্বের ফাঁদ পেতে। বৃষ্টি থেমে এসেছে, বাড়ি ফিরতে হবে।'

'বেশীক্ষণ বসতে হবে না তোমাদের। গল্প শেষ হয়ে যাবে এখনি।' পাণ্ডবী বলতে সুরু করল।

'ধর, শেষদিন মেয়েটির বাড়ি আমি গিয়েছিলাম। দেখলাম শূন্য বসবার ঘরে মেয়েটি একা বসে আছে। ছেলেটি চলে গেছে বিদায় নিয়ে দীর্ঘ দিনের মত। ওই ঘরে তারা একসঙ্গে বসে কত আনন্দ করেছে, মনে পড়ছিল মেয়েটির। দেখলাম মেয়েটির হাতে একটি পাত্র—সাদা কালো মীনায় কাজ করা পিতলের পাত্র। পাত্রটি ভরা ছাই।'

'ছাই?' আমরা বিস্ময়ে চীৎকার করলাম, 'পুরণো চিঠি-পত্র পুড়িয়ে ফেলেছিল বুঝি?'

'না। সিগারেটের ছাই।'

'সিগারেটের ছাই?'

'সিগারেটের ছাই। ছেলেটি দারুণ সিগারেটখোর ছিল। শেষ দিনে অনেক সিগারেট খেয়েছিল সে। সেই ছাই মেয়েটি সযত্নে তুলে রেখেছিল। অত অন্তরঙ্গ স্মৃতি আর কি হতে পারে? পোড়া সিগারেটের টুকরো, ঠোঁটে ছোঁয়ানো তার। আর ছাই।'

'অবাক হোয় না তোমরা। সেই ছাই রেখেছিল মেয়েটি—এক বছর, দুই বছর, তিন বছর।' পাণ্ডবী চুপ ক'রে গেল।

রুদ্ধ নিশ্বাসে আমরা বললাম, 'তারপর? কি হ'ল? আর বুঝি দেখা হয় নি?'

'না হ'লেই ভাল হত। পিতলের পাত্রের বদলে সোনার পাত্রে সিগারেটের ছাই স্থান পেত। তারপর মেয়েটির চিতার ছাই-এর সঙ্গে একদিন সেই ভস্মাধার মিশে যেত। তোমরা কবিতা লিখতে পারতে। কিন্তু সুন্দরের শুধু কল্পলোকেই স্থান। পৃথিবীটা গোল, ভয়াবহরূপে গোল। দেখা না হয়ে উপায় কি? অনিবার্যরূপে দেখা হ'ল দু'জনের।'

'ভালই তো হ'ল?' আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম।

'আগে শোন, পরে মতামত দিও। এই সঙ্গে আমারও বক্তব্য বলা হয়ে যাবে। পাণ্ডবী বলে চলল, 'স্মৃতির মূল্য অবশ্যই আছে, যদি সে স্মৃতিমাত্র হয়ে থাকে। জীবনে স্মৃতিকে স্থাপন করতে গেলে দেখা যায়, স্মৃতির মূল্য বহু-দিনই শেষ হয়ে গেছে। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের স্মৃতি রক্ষা করবে বলেছিল। সেই প্রতিশ্রুতি তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। দেখা হ'ল তাদের তিন চার বছর পরে।'

'তারপর?' আমরা সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

'তারপর, তারা দেখল তাদের প্রেম জ্বলে গেছে নিঃশেষে। ছাই হয়ে গেছে—ওই সিগারেটের ছাই-এর মত।'

পাণ্ডবী চুপ করল। একটু হেসে বলল, 'আমার গল্প শেষ হয়ে গেছে। বৃষ্টি থেমেছে। তোমরা উঠতে পার।'

আমরা অতৃপ্ত মনে উঠতে গিয়ে বললাম, 'এতও বাজে কথা বলতে পার, পাণ্ডবী! মিথ্যা একটা আষাঢ়ে গল্প বলে আমাদের সময়টা নষ্ট করলে শুধু!'

'মিথ্যা গল্প নয়। তোমাদের সময় আমি নষ্ট করি নি। সেই মেয়েটি আমি।'

আমরা চমকে উঠলাম। দরজার পাশে প্রতিদিনের মত পাণ্ডবী দাঁড়িয়েছে আমাদের বিদায় দিতে। আলোর নিচে দুই চোখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

'বর্ষার দিনে এমন একটা সত্যি গল্প শুনে তোমরা বাড়ি গিয়ে ভাববে শুয়ে

শুয়ে। স্মৃতি মূল্যহীন—ওই সিগারেটের ছাই। অনেক যত্নে রেখেও শেষে ফেলেই দিতে হয়।' পাণ্ডবী চাপা সুরে শেষবার বলল।

আমরাও পথে নামলাম। আমরা ভাবতে আরম্ভ করলাম। স্মৃতি যদি সিগারেটের ছাই, তবে পাণ্ডবী, তোমার চোখে জল কেন?

মন্ত্র

বিনির মাতা বড়ই বিব্রতা। তাঁর বয়স হয়েছে ষাটের কাছে। অথচ গলায় ঝুলছে পাক্কা উনত্রিশ বছরের অবিবাহিতা কন্যা। স্বামী নির্লিপ্ত দার্শনিক মানুষ। অধ্যাপনার ফাঁকে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করা তাঁর দ্বারা হয়ে উঠল না।

সত্যি বলতে কি, মেয়েদের বিয়ের বয়স পিছিয়ে গেলেও বিনির বয়সের কুমারীকে ঘটকালি ক'রে বিয়ে দেওয়া চলে না। লেখাপড়া শেষ ক'রে বিনি এখন গান শিখছে। দিনরাত গান-বাজনা নিয়েই আছে। আয় কিছু কিছু হয়। তাতে নিজের খরচটা চলে যায় বেশ। স্বচ্ছল সংসার পিতার। রোজগারী ভাইয়েরা। বিনির গায়ে আঁচ লাগে না।

মায়ের কিন্তু গা জ্বালা ক'রে ওঠে। ধরণ-ধারণ মেয়ের কেমন যেন। সেকালের দিন হ'লে কোন শাশুড়ী ঘরে নিতেন না। লাফিয়ে হাঁটছে, হ্যা-হ্যা ক'রে হায়েনার মত সর্বদা হাসছে। কথার তুবড়ী, সংসারের কাজে মন নেই।

কেমন ক'রে তাঁর মত প্রাচীনপন্থী শান্ত মহিলার দ্বারা বিনির মত কন্যার জন্ম সম্ভব হ'ল, বিনির মা বুঝে উঠতে পারেন না মোটে। সংস্কৃত লেখাপড়া মেয়েদের আদর্শ হোক—এটাই বিনির মায়ের মত ছিল। লাজনম্রা, তন্বী, এলোচুলের গোছা একহাতে সরিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলবে। হাঁটবে ধীরে; সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত। কথায় কথায় কানের কাছটা লাল হয়ে উঠবে।

বিনির মায়ের প্রকাশ্য ইচ্ছা ছিল এই। অবচেতনে ছিল আরও কতকগুলো অভীপ্সা। দেবদ্বিজে ভক্তি চাই। সকালে চন্দন ঘষে পুজোর ঘর গুছিয়ে বালিকা কলেজে যাবে শিবরাত্রির দিন শিবকে কামনা ক'রে উপবাস করবে। সগর্বে বিনির মা প্রতিবেশীদের ডেকে দেখাবেন তাঁর ইংরাজি কলেজে-পড়া মেয়ে কেমন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে।

প্রে মে র দে ব তা

পাড়াগাঁয়ে মানুষ বিনির মা। বিত্তশালী পণ্ডিত স্বামী সংগ্রহ করবার মত কিছুই ঈশ্বর দিয়ে পাঠান নি তাঁকে। যত আগেই স্বামী-সংগ্রহের কাজটা মিটে যাক না, বিনির মায়ের কৃতিত্বের তালিকায় জুটতো না। শ্বশুর যাচ্ছিলেন সেই গ্রামের বুক দিয়ে। পুষ্পচয়নরতা বিনির মা কেবল সুলক্ষণের জোরে প্রাচীন বনেদী পরিবারে বধূ হয়ে এলেন। অবশ্য কলেজের ছাত্র স্বামী বিদ্বান বা খ্যাতিবান হয়ে উঠলেন বিনির মায়ের ভাগ্যের জোরে।

ধীর-স্থির, শান্ত মানুষ বিনির মা। বিনি তাঁর মেয়ে এ একটা আকস্মিক অঘটন মাত্র। বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির কথা মনে পড়ে যায় সহসা।

অবশ্য যুগধর্মে যা হওয়া উচিত, বিনি বেচারী তাই হয়েছে মাত্র। চঞ্চল স্বভাবটা শুধু যুক্ত হয়েছে। মা যা চান—একালের মেয়েকে সেকালের ছাঁচে তৈরি ক'রে একটা আদর্শ দেখানো। হর্টিকালচারের মত বীজ মিশিয়ে নতুনতর ফুল ফোটানো। সে কি ক'রে হয়? বিনির মায়ের আদর্শ neither here, nor there—এই স্বর্গের নিচে। সুতরাং, বিনি বিনি; মা মা।

বিনি গলা ছেড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, লাফিয়ে সিঁড়ি ওঠে—

'আমি ডুবতে রাজী আছি,
আমি ডুবতে রাজী আছি।'

সেলাই-হাতে মা রাগতঃ স্বরে বলে ওঠেন, 'ডুবতে রাজী আছ তো আর কবে ডুববে, বাছা? এর পরে যে পায়ের পাতাটিও ডুববে না! বসে থাকার কি সময় আছে আর? মাথা ডোবার দিন তো চলেই গেছে।' বিয়ে-বাড়ি যায় বিনি —পাতলা শরীরে নীল সিফন জড়িয়ে, বাঁধা চুলে ফুল গুজে। থপ্ থপ্ ক'রে ভারিক্কি চালে মা বেনারসী বার ক'রে আনেন, মুক্তোর মানতাসা বাগিয়ে ধরেন। বিনি প্লাস্টিকের বুরুষ চালিয়ে মুখের পাশ থেকে চুলগুলো সরিয়ে হেলোর মত ফাঁপিয়ে রাখে। মা দাপাদাপি করেন,—'ওই চওড়া কপাল ঢেকে চুলগুলো দিলে মুখখানা নরম-নরম দেখায়। আর, অত চওড়া হাঁ-তে ছৎরিয়ে লিপ্স্টীক লেখো না, বাপু। হাঁ-খানা ছোট ক'রে আঁক।'

'ফ্যাসান কি জানো তুমি, মা? এখন স্টাইল হচ্ছে মুখের দোষগুলো ঢাকা নয়, দোষগুলোকে সদর্পে জাহির করা। যা যৌবন, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে হয়রাণ হোয়ো না।' বিনি ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল, আবার গান মুখে নিয়ে—

'ওগো বধূ সুন্দরী,
তুমি মধু মঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন।'

বিনির মা মনে মনে কপাল চাপড়ালেন। বয়সের গাছ-পাথর নেই, অথচ বিয়ের কথাটা ভাবে না মোটে মেয়ে। এত ছেলের সঙ্গে মেলা-মেশা আছে, অথচ প্রেম নেই। নিজেরা তো পারলেনই না। এ বয়সে ঘটকালির বিয়েটাই ছাই মানায় না কি? নিজে ঠিক করলেই তো হয়।

নিঃশ্বাস ফেলে বিনির মা ভাবলেন, একালের মেয়েরা শিবপুজো ছেড়েই সব মাটি করল। তাঁরা শিবরাত্রে সারা রাত্রি জেগে প্রহরে প্রহরে শিবলিঙ্গে গঙ্গাজল ঢেলেছেন। তবে না তাঁর মত রূপহীনা স্বামী পেয়েছে এমন! তাই বলি বিনিকে, বিনি শিবরাত্রি কর, শিবরাত্রি কর। যতই কেননা আধুনিক হোস, শিবরাত্রি ভিন্ন গতি নেই মেয়েদের। জানিস না, ছেলেরা সকলে মনে-প্রাণে সেকেলে। বব চুল, রং-চং সব কিছুই পছন্দ করে। কিন্তু, স্ত্রী চায় সতী পতিগতপ্রাণা। আধুনিকী যদি আধুনিক শাস্ত্রসম্মত লঘু, প্রেমলীলায় গাত্র ভাসায়, ক্রুদ্ধ স্বামী সম্পত্তি রক্ষার প্রথায় তাকে আগলে থাকে। সহস্র পুরুষ-সঙ্গ-প্রাপ্তা মেয়েকে তারা চায় প্রেমবিহ্বলা দয়িতারূপে, দেখা মাত্র পুরুষ মাহাত্ম্যে যে অভিভূত হয়ে স্বীকার করবে—

'কি আর বলব আমি,
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হোয়ো তুমি।'

জানিস বিনি, তোকে বলতে আর কি, তোর বয়স হয়েছে। আমার যখন বিয়ে হোল, তোর বাবা উনিশ, আমি তের। ফুলশয্যার রাতে তোর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে?' ছোট মেয়ে, লজ্জায় ঘাড় নেড়ে জানালাম, 'হ্যাঁ হয়েছে।' উনি তাতে খুসী হতে পারলেন না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার চেহারা তোমার কেমন লাগছে?'

তের বছরের পাড়াগেঁয়ে মেয়ে—নাটক-নভেল পড়া ছিল না। চট ক'রে বলে দিলাম, 'শিবঠাকুরের মত।'

জানিস বিনি, তোর বাবা যা খুসী হলেন! এতগুলো বছরেও কোনদিন এমন আনন্দ ওঁর আর দেখি নি। দেখলি বিনি, পুরুষমানুষ কি চায়?

কিন্তু, ছি ! এমন ক'রে মেয়েকে বলা চলে না। অথচ, চোখের সামনে মেয়েটা বিগতযৌবন হয়ে যাচ্ছে। এর পরে কি আর কেউ চাইবে ওকে ? এমনি তো ধরণ-ধারণ কেমন যেন ছেলে-ছেলে। রভসবিলাস বা মধুর ছল দিয়ে পুরুষকে বাঁধতে তো পারছেই না। এধারে গায়িকা হ'লে কি হয়, গানের সময়টা মুখে একটা মিষ্টরস বড় ঝরে না। কাটখাট্টা কথাবার্তা, হট্ হট্ ক'রে যা-তা বলে দেওয়া। মেয়েমানুষকে মোটেই মানায় না। যাই না কেন লোকে মুখে বলুক শিবপূজোর দিন চলে যায় নি। মন্ত্র-তন্ত্রের দরকার হয় বই কি।

নিরুপায় হয়ে বিনির মা গেলেন বোন প্রমীলার কাছে। কমা আর কোলনের মাঝামাঝি সেমিকোলন প্রমীলা আধুনিকত্বে। চোখ কপালে তুলে দিদির আশঙ্কা ম্লান ক'রে দিয়ে বললে, 'কি যে বল দিদি ! বিয়ে না ক'রে বিনির ক্ষতিটা কি হয়েছে ? তবু নাম করলে পাঁচজনে চেনে। আর, আমার একটা বিয়ে ক'রে কি হ'ল ? আমার গানের গলা তো বিনির চেয়ে মন্দ ছিল না !'

নিঃশ্বাস ফেলে কোলের বাচ্চাটিকে প্রমীলা ঠেলে দিল—'এরাই আমার কেরিয়ারের পথে দাঁড়িয়ে আছে। নইলে হয়তো আজ এক-ডাকের মানুষ হতাম আমি।'

প্রমীলা স্বামীর কাছেই ছিলেন, মুচকি হেসে টিটকারি দিলেন, 'বিয়ের বাসরে তো গলায় তিনসুরের শ্যামাসঙ্গীত মাত্র শুনেছিলাম। সঙ্গে এসেছিল একটা বেসুরো বাক্স-হারমোনিয়াম। গাইয়ে বিয়ে করেছি, কই এমন বোধ তো হয় নি !'

ফলে, যে গুরুতর দাম্পত্য কলহের উদ্ভব হ'ল, বিনির মায়ের প্রব্‌লেম তাতে নিঃশেষে ডুবে গেল।

বাধ্য হয়ে বিনির মা বাড়ি ফিরে বড়-বৌ মেখলাকে ডেকে কাছে বসালেন, 'দেখ মেখলা, বিনির কথা একটু ভাবা দরকার।'

সফরী নয়নে বিজলি খেলিয়ে মেখলা বলল, 'কেন মা, বিনির কি হ'ল আবার ?'

'আহা বাছা, খুলে না বললে তোমরা যে বোঝ না। গত মাসে বিনি যে ঊনত্রিশে পড়েছে। আর বিয়ে ক'বে হবে ?'

মেখলা স্বচ্ছন্দে উত্তর দিল, 'এখন মা, নিজে বিয়ে না করলে কে দেবে ? এমনধারা মেয়েকে তো ঘটকালি ক'রে বিয়ে দেওয়া যায় না !'

বিনির মা প্রায় কেঁদে ফেললেন, 'তাই তো মা, খেয়াল করল না কেউ, মেয়ের

বয়সটা চলে গেল। যুদ্ধ যুদ্ধ ক'রে সকলে এত মত্ত যে মেয়ের বিয়ে কানেও তুললে না। এখন মেয়ে যা ধিঙ্গী হয়েছে, কেউ যে পছন্দ করবে, তা-ও তো বুঝছি না।'

মেখলা হেসে উঠল, 'মা, আপনি বড় সেকেলে। আপনার বয়স তো বেশী নয়। আপনার বয়সের লোকে কত আধুনিকা থাকে। এটা তারা কোন সমস্যা মনে করে না।'

'কি আর বলব বউমা! নিজের মেয়ে হ'লে তবেই তুমি আমার জ্বালা বুঝবে। যাক, আজ রাত্রে আমি কিছু খাব না।'

এহেন পরিস্থিতিতে অকস্মাৎ বিনি নিয়ে এল বাড়িতে প্রায় সমবয়স্ক এক ভদ্রলোককে। প্রণবের পরিচয় নিয়ে ও তাকে দেখে বিনির মা স্বীকার করলেন যে, না যুগ যুগ ধ'রে শিবপূজোর ফলও এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু দিতে পারে না কাউকে।

কিন্তু, এ কি ক'রে হয়, হ'তে পারে? এমন ছেলে কি দেখে বিনিকে পছন্দ করবে? বিনির যে কোনই মহিলা-সুলভ গুণ নেই। তাতে বিনি একেবারে গ্রাহ্য করছে না! অন্ততঃ প্রণবকে বুঝতে দেওয়া উচিত যে, বিনি তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে এবং বিনির আদর্শ সেই একজন পুরুষ।

বিনির মা উদ্বেগে শুকিয়ে উঠলেন। অষ্টপ্রহর নানাভাবে বিনির প্রতি উপদেশ বর্ষিত হ'তে লাগল। শিবপূজোর তিথি কাছে-পিঠে থাকলে বিনির মা যেন-তেন প্রকারেণ কন্যাটিকে শিবরাত্রি করিয়ে ছাড়তেন। পূজোই একমাত্র পুরুষের বশীকরণ।

কিন্তু, উদ্দাম বিনি হেসে দিন কাটাতে লাগল, আর চিন্তায় বিনির মা আধ-খানা হয়ে যেতে লাগলেন। প্রণবের এ বাড়িতে আজই শেষ পদার্পণ, প্রত্যহ একবার বিনির মা সেকথা ভেবে শিউরে উঠতেন। তবু, সঠিক কিছু না-জানা গেলেও সূর্যের বা চন্দ্রের মত প্রণব নিত্যই আসতে লাগল। বিনির মা না-বোঝার কষ্টে ছটফট করতে লাগলেন—কিছু করতে না পারার যন্ত্রণায় ব্যাকুল হ'লেন।

এমন সময়? বসবার ঘরের পাশে পুরণো জিনিসের বক্সরুম। বিনির মা গিয়েছিলেন একটা টীনের সন্ধানে। চলে আসছেন নিঃশব্দে, শুনতে পেলেন প্রণব বলছে, 'তা হ'লে বিনি, আমাকে লাগে কেমন শুনি?'

নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে বিনির মা আড়ি পাতলেন। এইবার? কিন্তু, এ কী? উচ্চ হাসিতে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত খান খান ক'রে দিয়ে বিনি বলছে, 'যেন একটি গর্দভ!'

বিনির মা আর পারলেন না। মেয়েকে সমুচিত শাসন করার আগে তার হতাদৃষ্ট কপালে করাঘাত করতে উদ্যত হ'লেন। কিন্তু কিছুই করতে হ'ল না। দেখা গেল বিনির মা দিব্যি আরামে নিজের খাটে পা তুলে বসে পানের সঙ্গে জরদা চিবোচ্ছেন। এতদিনে তাঁর মুখে নিশ্চিন্ত শান্তি।

বসবার ঘরের পরদা সরে যেয়ে বিনির মা যে দেখতে পেয়েছিলেন প্রণবের মুখ! যত বোকাই হন, ও মুখের ভাব নির্ণয়ে বিনির মায়ের ভুল হয় নি। স্বামীর যে অমনি মুখই দেখেছিলেন তিনি ফুলশয্যার রাত্রে। আনন্দে প্রেমে প্রণবের মুখ উজ্জ্বল।

না, মন্তর-তন্তরগুলোর ভাষাই বদলে গেছে।

শিল্পী

আমার ইজেলের ওপর ছবির ক্যান্‌ভাসে রং আজ ঠিকমত পড়ছে না। কাগজে স্কেচের সঙ্গে মিলিয়ে লাইনের আঁকও ঠিকঠাক মত বসছে কই? আকাশের নীলের সঙ্গে মেলানো রং আমার স্টুডিওর। বাড়ির সবচেয়ে নিরাপদ নিড়।

আজ ঘরের টেবিলে কে নীল স্ন্যাপ ড্রাগন রেখে গেছে? তুলী রেখে মার্বেলের ত্রিপদীর কাছে দাঁড়ালাম। সামনের জানালার কাঁচের পাল্লার গায়ে রংয়ের ছিটে লেগেছে। আমারি অসহিষ্ণু তুলীর কীর্তি। আমার গায়ে জাপানী কিমোনোর পুরোণো সুরার মত লালচে রং-এও শিল্পীর অসহিষ্ণু তুলীর ছাপ। আমার বিশেষত্ব আমি অসহিষ্ণু, আমি খেয়ালী। ধনী পিতার একমাত্র কন্যার শোভা পায় খেয়াল। তায় সে চিত্রকর।

নীল স্ন্যাপ-ড্রাগন নীলার গুচ্ছ যেন—মায়ের গলার এমনি নীলার ধুকধুকি—হীরকখচিত, মানসনেত্রে দুলে গেল। আজ আকাশে অনেক নীল রং, আজ বর্ষার অন্তিম শয়ন চিহ্নিত হয়েছে চক্রবালে। মালীর বুদ্ধি আছে। এমনি নীলই এ ঘরে মানায় আজ।

স্ন্যাপ-ড্রাগনের বৃন্তে চাপ দিলাম। প্রসারিত হ'ল দুইটি পরাগ দুই দিকে। ড্রাগন যেন হাঁ করল। না, না। যেন কার প্রসারিত অধরোষ্ঠ। চরম পিপাসা তার। তাকে পানীয় দাও। তাকে পিপাসার শান্তি দাও।

চলে এলাম আবার ইজেলের কাছে। আবার তুলী হাতে নিলাম। কিন্তু চোখ চলে গেল ওই সামনের রাস্তায়। রাস্তা পার হয়ে অভ্যস্ত দৃষ্টি ও-বাড়ির জানালায় তাকালো। সবুজ মরকতের মত পর্দা ঢাকা, আমার শাড়ির রং।

আমি জানি, ওই পর্দা এখনই স'রে যাবে। ওর পেছন থেকে ফুটে উঠবে একটি মুখ। শাদা হাতীর দাঁতে খোদা একখানি মুখ। কাল চুল কাকের ডানার মত। চোখ সঙ্কীর্ণ তির্যক। ঈগলের দৃষ্টি চোখে। দুই ঠোঁট জলের নিচের প্রবাল। অতল সমুদ্রের উপমেয় আরও আছে। শাদা-শাদা দাঁত তার মুক্তোয় গাঁথা। চিবুকে অজন্তার মর্মর স্বপ্ন। সে মুখ শিল্পীর প্রেরণা।

তারপর? এখানেই অজন্তার স্বপ্নের শেষ নয়। দৃঢ়-প্রশস্ত বক্ষ, বৃষভ-সক্ষম স্কন্ধ জেগে উঠুক মুখের নিচে। দীর্ঘ বাহু আলিংগনদক্ষ, জানু নির্বাসিতা সীতার পঞ্চবটির উপাধান। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিল তিল আহরণ-করা সে তিলোত্তম।

কিন্তু, আজ ওই পর্দা সরে যাবে না, জানি আমি। আজ জানালার পাশ শূন্য। সে শূন্যতা আর পূর্ণ হবে না।

আমার জীবনে তাকে কোন স্থান দিই নি। সে অযোগ্য। দেহ ছাড়া সম্পদ নেই তার। আমার সম্পদ, আমার কৃতিত্ব অনেক বেশী মূল্যবান বস্তু কিনতে পারে। আমার দিবারাত্রিকে ভরে রাখার যোগ্যতা কই তার?

তবু, তুলী আমার প্রাকৃতিক ছবির পরিধি ছেড়ে ব্যগ্র হয় সেই অন্তর্হিত মুখ-চিত্রণে। দেয়ালে পেছন ক'রে একখানা ছবি আছে ওর। একদিন এঁকেছিলাম। শেষ হয় নি। শেষ করবার আগেই আমার জীবনে ওকে শেষ ক'রে দিলাম। এখন সেই অসমাপ্ত ছবি কেন আমার অন্য ছবির পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়?

চিহ্ন আমি রাখব না। চিহ্ন রাখা আমি শিখি নি। খেয়ালের বন্যা আমার, স্রোতে বহু স্মৃতি ভাসিয়ে নিয়েছে। এ স্মৃতিরও এখানে শেষ হোক। অতল বন্যার শেষে বিস্মরণীয় পলিমাটি আছে। আছে নিশ্চিহ্ন পঙ্কবিলোপ পুরাতন তটভূমির।

ছিঁড়ে ফেললাম ছবি। ও-পর্ব এখানেই শেষ হোক। ফিরে এলাম ইজেলের কাছে। স্ন্যাপ-ড্রাগনের প্রসারিত ওষ্ঠে পানীয় দেবার যেমন দরকার হয় না, তেমনি আমার নিরবচ্ছিন্ন দিনযাত্রায় কারুর ছবি দোলে না দিনরাত্রির প্রাচীরে। আমি শিল্পী।

অসময়ে এল মালিকা। সন্ধ্যা এখনও নামে নি। এখনও আকাশে উড়ন্ত ডানার ছাপ পড়ে নি। আরও সময় ছিল আলোর। ছবি আমার শেষ হয়ে যেত। মালিকা বসে থাক না। আজ ছবি আমি শেষ ক'রে তবে উঠবো। আজ আকাশে-বাতাসে কেমন যেন স্বর বাজতে চায়? সে স্বর বলেঃ বিদায়! এ স্বর আমি ভুলব।

'এলা, চোখটা নষ্ট করছ কেন? হৃদয় তো বহুদিনই গেছে। চোখটা সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জন দিও না।'

মালিকা এমনি ক'রেই কথা বলে—কথায় হুল ওর। কাঁটাভরা ফুলের মালা ও। আসন দেখিয়ে বললাম, 'একটু বোস। এটা শেষ ক'রে উঠি। এক্ষুনি আলো চলে যাবে।'

'হে আত্মবিস্মৃতা শিল্পী, আলো অনেকক্ষণ আগেই গেছে। তুমি ওঠো। একি! ছেঁড়া ছবি কার?' টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে চেয়ে দেখল মালিকা, 'ও বুঝেছি।'

'ঠিকই বুঝেছ। বিজয়ের ছবি।'

'চলেই তো গেছে। তাড়িয়েই তো দিয়েছ। পাড়া থেকে উঠে গেছে পর্যন্ত। ছবিটাও ছিড়ে ফেললে!' মালিকার গলার স্বর পূরবীর মত করুণ।

'তুমি জানলে কি ক'রে বিজয় চলে গেছে এ পাড়া ছেড়ে?' আমি ছবি রেখে উঠে মালিকার কাছে এলাম। চক্রাকার চামড়ার আসনে বসেছে ও, স্ন্যাপ-ড্রাগনের দোলানি ওর সামনে।

'কারণ, আজ সকালে মমতার বাড়ি ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'মমতার বাড়ি বিজয় কেন?'

'মমতার দাদা ছবির ডিরেক্টর।'

'তাতে কি?'

মালিকা বিষাদময় দৃষ্টি আমার মুখে রেখে বলল, 'তুমি কি সত্যই বুঝতে পারছো না, এলা? তুমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছ ওর যোগ্যতা নেই বলে। একমাত্র যোগ্যতা যা ওর, তাই বাজারে পণ্য করতে গেল।'

'তার মানে?' আমার গলাও যেন নিজের কানে অন্যের গলা শোনা গেল। তা যাক, আমি কথার উত্তর চাই।

মালিকা এক ভাবেই বলে গেল, 'বিজয় মমতার দাদার নতুন ছবিতে নেমেছে। নায়ক নির্বাচিত হয়েছে ও।'

'বি-জ-য় ছ-বি-তে নে-মে-ছে।' ছাড়া-ছাড়া কথা বলে আমি মালিকার পাশের দ্বিতীয় চক্রে বসে পড়লাম। শুধু হাতের আঘাতে স্ন্যাপ-ড্রাগনের একটা ফুল খসে পড়লো নিঃশব্দে।

'কেন নামবে না? এতদিন যে নামে নি কেন, এটাই আশ্চর্য। একমাত্র লাইন ওর সিনেমা। অমন রূপ যার, সে তো দুর্লভ নায়ক। তার সঙ্গে কণ্ঠ, আবৃত্তি, ভাব। একদিনে বিখ্যাত হয়ে যাবে বিজয়।'

মনে পড়ে গেল, সখের অভিনয়ে বিজয়ের উৎকর্ষ। মনে পড়ে গেল, বিজয়ের গলার ভেলভেটের মত মসৃন, গম্ভীর স্বর। আমার সংগে অন্তরঙ্গ পরিবেশে বিজয়ের মুখের লোভনীয় ভঙ্গিমা, মনে পড়ে গেল।

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে মালিকা বলে চলল, 'প্রেম এখন বিজয়ের পায়ে পায়ে ফিরবে।'

...আমার সারা ঘর ভরে গেল ছবিতে, অসংখ্য ছবিতে। বিজয়ের ছবি। আহা, ওর ছবি না এঁকে গাছ পাতার প্রাণহীন ছবি কেন এঁকেছি? ওর দুর্লভ রূপ যে আমার কৃতিত্বের বাহন হ'ত।

কত ছবি বিজয়ের! মিলিয়ে গেল ছবিগুলো একে একে। একেবারে ঘর ভরে গেল আলোকচিত্রে। বিজয় আর বিজয়। হাসি মুখ, গম্ভীর মুখ, করুণ মুখ। শুয়ে আছে, বসে আছে, হেঁটে যাচ্ছে। বিজয়ের হাত, পা চোখ। বিজয়ের ঠোঁট।

সেই অধর যুক্ত হ'ল অন্য অধরে। বিজয় আর নায়িকা। নানা ভাবের বিজয়ের সঙ্গে অসংখ্য নায়িকা। প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে কত মেয়ে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে বিজয়কে।

পোস্টারে বিজয়, সাময়িকীতে বিজয়। নির্জন শয়নে কত নারীর বক্ষে বিজয়ের ছবি স্থান পেয়েছে। কাগজে পড়ছে তারা বিজয়ের জয়-যাত্রার কাহিনী। রেকর্ড রেডিওতে বিজয়ের গলা বিহ্বল ক'রে তুলেছে তরুণীদের।

বিজয়ের হাতে চিঠি। বিজয়ের ঘরে রূপের ভিড়। বিজয়ের নিঃসঙ্গতা চূর্ণ হয়েছে নারীর অবিরাম পদক্ষেপে। সহস্র নারীর সম্পত্তি বিজয়। সারা জগৎ বিজয় ছেয়ে ফেলেছে—আমার ঘর ছাড়া হয়ে।

এই সব ছবি আমার চাই। এই সব বিজয় আমার একার চাই। সমস্ত বিশ্বের সম্পত্তি আমি একা কিনবো। বিজয়ের যোগ্যতা আমার সম্পত্তি। বিজয়

আমার ঘরে বন্ধ হয়ে আমার চোখের সম্মুখে তার ভঙ্গিমা, তার রূপ একমাত্র আমারই চোখের সামনে তুলে ধরবে। বিজয়ের প্রেক্ষাগৃহে একমাত্র দর্শক থাকবো আমি। এর চেয়ে বিলাস আর কি হতে পারে? বিজয়কে আমি মনোপোলি নেব।

উঠে একটানে কিমোনো খুলে ফেললাম। প্রায়সমাপ্ত ক্যান্‌ভাস্ একটানে নামিয়ে দিলাম। হয়তো বা একটু ছিঁড়েও গেল।

'আহা, ওকি, ওকি?' মালিকা প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠল, 'এত সুন্দর ছবিখানা! শেষ হয়ে এসেছে। নামালে যে অমন ভাবে?'

'এখানে অন্য ছবির ক্যান্‌ভাস্ বসাবো। গাছপালা আর আঁকবো না। এখন থেকে শুধু মানুষ আঁকবো।'

'মানুষ কে?'

'বিজয়।'

'তাকে পাবে কোথায়?'

'এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি ওকে আনতে।'

'আশ্চর্য তুমি, এলা!'

মালিকার কথায় কান দিলাম না। এতদিনে একটা মূল্যবান বস্তু পেয়েছি কিনবার মত। সারা জগতের সম্পত্তিকে আমি একা কিনে নেব।

সত্য মিথ্যা

দীপালী কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষয়ত্রী। কিন্তু কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী বলতে যে রুক্ষ, নীরস চেহারা সাধারণতঃ বিনা কারণে মনে উদিত হতে চায়, দীপালী সে পর্যায়ে পড়ে না। বরঞ্চ তার পেলব তনুদেহে সরসতার প্রাচুর্য একটু বেশী।

দীপালীর বয়স একুশ। দু'বছর হ'ল কাকার কাছে অতিকষ্টে আই-এ পাশ ক'রে তাঁর চেষ্টায় এই চাকুরিটি জুটিয়ে নিয়েছে। সংসারে একমাত্র নিকটজন বিধবা বৃদ্ধা মাতাকে সঙ্গে ক'রে হাজরা রোডের লাগাও একটি গলির মধ্যে এক দোতালার একাংশ ভাড়া নিয়ে সে পৃথক সংসার করছে।

বিকেল পাঁচটায় দীপালী একতলার সাঁৎসেতে রান্নাঘরে রাত্রির রন্ধনের আয়ো-

জন করছিল। উনুনের উপর ডালের হাঁড়ি চড়ানো, উনুনের পাশে দীপালী দুই হাতে মাথা ধ'রে বসে আছে, মাথায় তার ভিজে গামছা জড়ানো। আজ দিন পনেরো হ'ল দিনরাত্রি তার মাথায় এমনি যন্ত্রণা থাকে। দিন পনেরো হ'ল মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে হিমাংশু ঘোষ মারা গেছে। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, ধনী তরুণ বয়স্ক হিমাংশু ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে অনেকের মনেই হয়তো আঘাত-মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু, দীপালী? যেদিন হাসপাতালের দুর্ঘটনা বিভাগে হিমাংশু ঘোষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তার পুরো পাঁচদিন পরে দীপালী শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে, তিনদিন সে মায়ের সাশ্রু অনুরোধ সত্ত্বেও দুই এক চুমুক দুধ-জল ভিন্ন কিছু খায় নি। আজ পনেরো দিন সে স্কুলে যেতে পারছে না।

পাঁচদিন পরেও দীপালী উঠত কি না জানি না। তবে, বৃদ্ধা মাতা অতি নাটকীয় ভাবে একখানা মরচে ধরা ছোরা নিয়ে ঘরে ঢুকে যখন সেটা নিজের বুকে বসাবার হাস্যকর অভিনয় করলেন তখন বাধ্য হয়ে দীপালীকে শয্যা ছেড়ে উঠতে হ'ল, বাধ্য হয়ে জীবন-যাত্রার ভার আবার মাথায় তুলে নিতে হ'ল। মায়ের জন্যই আজ এই উনুনের পারে ডালের হাঁড়ি, ঝোলের কাঁসি নিয়ে বসা—আবার তাঁর জন্যই কাল থেকে স্কুলে যেতে হবে।

কিন্তু, হিমাংশুর জন্য এত শোক কেন? হিমাংশু তার কে? বিকালের বিলীয়-মান রৌদ্ররেখাটির দিকে চেয়ে দীপালীর মনে হ'ল, হিমাংশু তার কে, আর সে হিমাংশুর কতখানি সেকথা জগতকে জানাবার আগেই কেন এমন ক'রে হিমাংশু চলে গেল?

দীপালীর পায়ের কাছে খোলা সাপ্তাহিকপত্র একখানা, তাতে হিমাংশু ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন প্রকাশিত হয়েছিল। বাইরের দিকে চেয়ে দীপালী বহুক্ষণ তন্ময় হয়েছিল। সহসা চমক পেয়ে উনুনের দিকে চেয়ে দেখে ডালের হাঁড়ি থেকে জল উথলে পড়ে পড়ে আগুন প্রায় নিভে যাবার জোগাড় হয়েছে। জলের ঘটী হাতে দীপালী ডালে জল দিতে পিঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নিজের আধময়লা শাড়িখানার দিকে চোখ পড়ায় অভ্যাসক্রমে তার মনে হ'ল: এত ময়লা কাপড় পরে আছি, এখন যদি ও আসে!

যদি ও আসে? ও আর আসবে না, ও আর আসবে না! দীপালীর অবশ হাত থেকে জলের ঘটী গড়িয়ে ঝনৃঝনৃ শব্দে মেঝেতে পড়ে গেল। নিচু হয়ে ঘটী

তুলে কোনমতে ডালের হাঁড়িতে জল দিয়ে দীপালীকে কাগজখানা চোখের সামনে তুলে ধরলো। হিমাংশুর জীবনী সে যা জানে, যদি তার বেশী কিছু এখানে থাকে!

একটুখানি পরে বিশেষ একটি প্যারাতে চোখ পড়া মাত্র দীপালী বিদ্যুৎচমকের মত চকিত হয়ে প্রথমে বিবর্ণ, পরে আরক্ত হয়ে উঠল। হাত অজ্ঞাতে মুষ্টীবদ্ধ হ'ল, অধর হ'ল দংশনে খণ্ডিত। দীপালী কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

প্রথম অনুভূতিতে এল দীপালীর ক্রোধ। ডালের হাঁড়ির জল আবার পড়ে পড়ে উনুন নিভে গেল, মাখা আটা শুকিয়ে উঠল। অসহ্য এসব—সে ভাবতে চায়।

দীপালীর পায়ে লেগে পিতলের থালায় কাটা-তরকারী উল্টে পড়ল। কাগজটা হাতে নিয়ে সে ওপরে নিজের পায়রার খোপের মত ছোট ঘরটিতে চলে এল।

কেরোসিন কাঠের টেবিলটার পাশে লোহার চেয়ার টেনে দীপালী বসল। কিছু ভাবা এখন তার পক্ষে অসম্ভব। মাথার মধ্যে যেন সমস্ত জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তায় মই কাঁধে ক'রে আলোওয়ালা দীপালীর জানালার নিচে গ্যাসের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। সেই আলোর একটি রশ্মি দীপালীর অন্ধকার ঘরকে ক্ষীণালোকিত ক'রে তুললো।

আজ এক বছর পঁচিশ দিন হ'ল তার সঙ্গে হিমাংশুর আলাপ। এই সুদীর্ঘ এক বছরে তারা পরস্পরের বড় কাছে সরে এসেছিল।

কয়েকটি ছোট ছোট স্কুলের মেয়েদের দীপালী চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাচ্ছিল স্কুলের বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে পুরাণো কোচোয়ান ফৈজুর গাড়িতে। কর্পোরেশন স্কুলে মেয়েদের গাড়ি ছিল না, তবে ফৈজুকে বলে দিলে দরকার মত তার ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যেত। ফেরবার পথে চৌরঙ্গী ও এল্‌গিন্‌ রোডের মোড় থেকে হিমাংশু ঘোষের মিনার্ভা গাড়ি বুড়ো ফৈজুর নড়বড়ে পেছনের চাকা নিঃশব্দে এসে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। দোষ ছিল হিমাংশুর চালকের, সে মোড় বাঁকবার সময়ে হর্ণ দেয় নি।

মেয়েগুলোকে রোরুদ্যমান অবস্থায় উদ্ধার করা হ'ল। আঘাত কেউ পায় নি, ভয়ে কেঁদে উঠেছে। বুড়ো ফৈজু গাড়ির দুর্দশা দেখে চেঁচিয়ে উঠল আর্তস্বরে, পয়সা খরচ করে সারাবার সঙ্গতি ফৈজুর ছিল না।

সাময়িক উত্তেজনায় ভীরু দীপালী সেদিন হিমাংশুর কাছে এগিয়ে যেয়ে বলতে পেরেছিল, দোষ আপনার ড্রাইভারের। গরিব মানুষের গাড়িটা কেন ভেঙে দিলে ?

হিমাংশু সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল শিক্ষয়িত্রীর মুখের দিকে। শেষের কথায় তার অবাধ্য স্বর কেঁপে উঠেছে, অসহায় হরিণ-নয়নে জলের ছায়া। চারিপাশে ক্রন্দনমানা ছোট মেয়েদের মধ্যে তাদের শিক্ষয়িত্রীর অবস্থা তাদের থেকে বিশেষ সংযত নয়।

দোষ আমার ড্রাইভারের সত্যি—হিমাংশু উত্তর দিল—আপনার কোচোয়ান তার গাড়ি সেরে নিক, যা খরচ লাগে সব আমি দেব। আর, এ কয়েক দিনের ক্ষতি-পূরণ যা হয়। কিন্তু, আপনারা যাবেন কিসে ? হিমাংশু ইতস্ততঃ তাকিয়ে তার ড্রাইভারের পাশে বসা তথমাআঁটা দারোয়ানকে ট্যাক্সি আনতে হুকুম করল।

আপাততঃ এইটে রাখুন, ট্যাক্সিভাড়া আর গাড়িটা ঠেলিয়ে নিয়ে যাবার খরচা বাবদ। পাঁচখানা দশ টাকার নোট।

এত কেন ? সঙ্কুচিত দীপালী বলল।

এত কই ? এর কম সঙ্গে রাখতে নেই। বেশী কিছু পথেঘাটে থাকা ভাল। আপনার বাড়ির ঠিকানাটা ? আমি কাল সন্ধ্যার পরে যেয়ে আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলবো। এখন একটা মীটিংএ যাচ্ছি, দাঁড়াবার সময় নেই। হিমাংশু ডাইরি বার ক'রে দীপালীর ঠিকানা টুকে নিল।

দশ মিনিটে ব্যবস্থা শেষ ক'রে হিমাংশু গাড়িতে ওঠবার পূর্বমুহূর্তে দীপালী জড়সড় ভাবটা কাটিয়ে প্রশ্ন করল, এত টাকা ! অনেক যে বাঁচবে। আপনার ঠিকানাটা ?

আমার ঠিকানার দরকার কি ? কাল সন্ধ্যায় আমি সশরীরে আপনার ওখানে হাজির হব। ওঃ, তবে—হিমাংশু প্রাণখোলা হাসি হাসল, যদি গাড়ি সারাবার খরচ না দিয়ে পালাই, না ? এই নিন কার্ড আমার—অফিসের ঠিকানা আছে। ঝড়ের বেগে হিমাংশুর গাড়ি দীপালীকে উত্তরের অবকাশ না দিয়ে চলে গেল।

ফৈজু কুলী ডেকে গাড়ি ঠেলাবার বন্দোবস্ত করতে করতে প্রসন্ন মুখে বলে উঠল, দিদিমনি, বাবু তো রাজালোক আছেন ! নড়বড়ে গাড়িখানার এই সুযোগে আগাগোড়া নতুনত্বলাভের সম্ভাবনায় সে তখন পুলকিত।

দীপালী কোন উত্তর দিল না। হিমাংশুর কালো স্যুটে আবদ্ধ তরুণ মূর্তির

উদ্দেশে শুধু মনে মনে বলল, কেন, একথা বললেন? আপনাকে অবিশ্বাসের কথা তো আমার মনেও আসে নি।

পরের দিন হিমাংশু দর্শন দিল। লাল রংয়ের একখানা ব্যুইক গাড়ি নিজে চালিয়ে দীপালীর সরু গলির সামনে থামল। আজ সে শুভ্র শান্তিপুরী ধুতি চাদর পরে এসেছে। উত্তরীয় উদ্গত-সৌরভ দীপালীর ক্ষুদ্র ঘরখানা সচকিত ক'রে তুলল।

হিমাংশুর ব্যবস্থায় ফৈজু কোচোয়ানের মুখে হাসি ফুটলেও হিমাংশুর ব্যবস্থার শেষ বোধ হয় সেখানেই হতে পারল না। সে প্রায়ই দীপালীর বাড়ি আসতে লাগল। তার মত অভিজাত দীপালীর দরিদ্র সংসারে কি মধু পেতো বোঝা কঠিন হ'ল না। এমন দিন এলো যে হিমাংশু ঘোষ দীপালীকে আপনির পরিবর্তে তুমি বলতে আরম্ভ করলে, মিস বোসের বদলে দীপালী হ'ল।

আরও কয়েকদিন পরে দীপালীরও আপনি খসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল হিমাংশুর প্রাত্যহিক আগমন। এক গাড়ির দুর্ঘটনায় আলাপ হ'ল তার সঙ্গে, আর এক গাড়ির দুর্ঘটনায় সে চিরদিনের মত সরে গেল।

এতদিনের এত আনন্দ, এত মাধুর্য, এত প্রেম একি মিথ্যা হয়ে যাবে! শুধু সত্য থাকবে কাগজে লেখা ছোট কয়েকটি কথা!

আলোর সুইচ টেনে দিয়ে দীপালী কাগজখানা বিস্তৃত ক'রে ধরলো চোখের সম্মুখে। তার সমস্ত দেহে যেন আগুন ধ'রে গেছে, মাথার মধ্যে তাণ্ডব আরম্ভ হয়েছে। এ খবর, এ খবর সে জানতো না; সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি!

মানুষ এমন! হিমাংশু এমন!

কাগজে লেখা আছে—'ব্যবসায়ী হিমাংশু ঘোষকেই সকলে চেনেন। কিন্তু আদর্শ স্বামী হিমাংশু ঘোষের পরিচয় অতি নিকট আত্মীয় ব্যতীত বিশেষ কেহই জানেন না। সুবিখ্যাত দত্ত পরিবারের বিদুষী কন্যা তপতী দত্ত এম-এ'র সহিত হিমাংশু ঘোষের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী কঠিন পীড়াগ্রস্তা ছিলেন। নানা কর্ম-কোলাহলের মধ্যেও এই আদর্শ প্রেমিক তাঁহার চিররুগ্না পত্নীর পৃথক বাসস্থানে প্রতিদিন কিছুক্ষণ অবসর যাপন করিতেন। শোকাচ্ছন্না মিসেস ঘোষকে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।'

মিথ্যা, সব মিথ্যা! কে বলে হিমাংশু বিবাহিত? তুমি আজ নেই বলে

সকলে তোমার নামে এতবড় মিথ্যা প্রচার ক'রে যাচ্ছে! হিমাংশু যে অবিবাহিত এই কথাটাই সে দীপালীকে জানিয়েছিল। তবে ভবিষ্যতে তার বিবাহের সম্ভাবনা কোথায় তার আভাসও হিমাংশুর কথায় পেতে অসুবিধা হয় নি। আজ হঠাৎ, মিসেস ঘোষ, তুমি কোথা থেকে এলে?

কিন্তু এই কাগজ তার হাতে কে দিল? সে তো কোন কাগজ কেনে নি, তার বরাদ্দ দৈনিকখানিতে শোক-সংবাদ হেডিং-এ ছবি সমেত হিমাংশুর জন্ম-মৃত্যু বেরিয়েছিল মাত্র। এ কাগজ টেবিলে ডাকে এসে পড়ে আছে দেখে অন্যমনা ভাবে সে খুলে ফেলে হাতে নিয়ে নিচে নেমেছিল। সাপ্তাহিকটির সঙ্গে বালির কাগজের লেবেল এখনও ঝুলছে। তুলে দেখল দীপালী। সুস্পষ্ট এনার হস্তাক্ষর।

এনার ঈর্ষার দীর্ঘনিশ্বাস দূর থেকে এসে হিমাংশুর স্মরণসৌধে তা হ'লে লেগেছে! সেই জন্মদিনের উৎসবটি!

বেশ একটু আয়োজন করা হয়েছিল সেদিন সাধ্যমত। এতদিন দীপালীর জীবনে বহু উৎসব এসেছে, গেছে, হিমাংশু আসে নি। এবার হিমাংশুকে ধরেছে দীপালীর পলাতকা দিন—তাই জন্মদিনে উৎসবের সুর লাগাতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন দীপালীর বৃদ্ধা মা। খুড়তুতো ভাই অশোককে মা বলেছিলেন খেতে। এতদিন দীনভাবে দেওরের বাড়ি পড়ে থেকে থেকে নিজেরা যেন তাদের চোখে বড় নেমে গিয়েছিলেন। আজ সে বাড়ির একজনকেও অন্ততঃ নিমন্ত্রণ ক'রে দেখাতে হবে তাঁর ভাবী জামাইকে, পরিচয় দিতে হবে তার ঐশ্বর্যের।

ইতিপূর্বের জন্মদিনের আনুসঙ্গিক ছিল শুধু একটু পায়েস, অনেকখানি আশীর্বাদ। এবারে একখানা কোরা লাল পেড়ে জ্যালজ্যেলে তাঁতের শাড়ি সংগ্রহ হয়েছিল। রাত জেগে মা রসবড়া, কাঁচাগোল্লা তৈরী করেছিলেন পায়েসের সঙ্গে। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে স্কুল থেকে ফিরবার পথে দীপালী এক চায়ের দোকান থেকে কেক আর চিংড়ির কাটলেট কিনে এনেছিল কাগজে মুড়ে। বাড়ি ফিরে দেখে মা-ও বুদ্ধি খরচ ক'রে ঠিকে ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে কয়েকটা ডিম এনে আমিষের বন্দোবস্ত করেছেন পাশের ফ্ল্যাটের বৌকে ডেকে।

মায়ের মনোভাবে মুখে অবজ্ঞা দেখালেও দীপালী যোগ দিয়েছিল সাগ্রহে। তার নিজেরও ইচ্ছা করছিল স্কুলের অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীকে ডেকে এনে নিজের সম্পত্তি ও সৌভাগ্যটা দেখিয়ে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুললো না। হিমাংশু জনতা পছন্দ করে না। দীপালীর ছোট জগতেও একটু বেশী লোক

হয়ে গেলে সে বিরক্তি অস্বস্তি প্রকাশ করতো। তাছাড়া, ইংরাজির শিক্ষয়িত্রী লীনা মিত্র দীপালীর চেয়েও সুন্দরী, আর বড় গায়ে-পড়া। যদি সে হিমাংশুকে ভোলাবার চেষ্টা করে? যদি ভবিষ্যতে এই আলাপের সূত্র ধ'রে সে অগ্রসর হতে চায়? যদি হিমাংশু ভুলে যায়?

সেদিন একথা মনে উদিত হওয়া মাত্র দীপালী শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। হিমাংশু যে তাদের কুঁড়েঘরে অনেক সাধ আকাশের চাঁদ! তাই প্রতি পদক্ষেপে ভয় হত যদি সে চাঁদ ফাঁকি দিয়ে যায়। তাই বুঝি হিমাংশুর অজস্র সোহাগ যখন দেহ প্লাবিত ক'রে দিত, তখনও মন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হতে পারে নি। বারে বারে চোখ বন্ধ ক'রে ভেবে নিতে হত, এ কি সত্য? তা হ'লে মিথ্যার বীজ কি সত্যই ছিল?

সহকর্মিনীদের বলতে না পারলেও দীপালী মাসতুতো বোন এনাকে বলেছিল আসতে। মাসীমার অবস্থা ভাল; এনা প্রায় দীপালীর সমবয়সী। এতদিন কেবল এনার সুখৈশ্বর্যের দিকে দীপালী লুব্ধনেত্রে দূর থেকে চেয়ে থাকতো, আজ নিজের দুর্লভ রত্নটিকে দেখাবার লোভ সে সংবরণ করতে পারলো না। এনাকে ভয় ছিল না। রূপ ও গুণহীনতায় এনার কুমারীত্ব ঘুচতে পারছিল না।

হিমাংশু এক সেট রূপোর প্রসাধন পাত্র ও একটি হীরকাঙ্গুরীয় উপহার দিয়েছিল। তাছাড়া ফুল—অসংখ্য পুষ্পপ্রাচুর্যে দীপালীর ছোট ফ্ল্যাটটি সুরভিত হয়েছিল সেই সন্ধ্যায়।

হিমাংশুর উপহার-গৌরবে উজ্জ্বল দীপালীর মুখের দিকে চেয়ে মা অশোক ও এনাকে স্বচ্ছন্দে বলেছিলেন, 'আজ বাদে কাল জামাই হবে সত্যি, তবু বলতে হয়, এত দরাজ হাত না গুটোলে আমার হিমাংশুর সব উড়ে পুড়ে যাবে যে!'

দীপালী 'আজ বাদে কাল জামাই' কথাটিতে কোন আপত্তি জানায় নি। কারণ তারই একটু আগে সেই ফুলের স্তূপ উজার ক'রে দীপালীর গায়ে মাথায় ঢেলে দিতে দিতে সহাস্য হিমাংশু বলেছিল, 'কিগো দীপালীকা, মালাকারের পদ থেকে শেষে বরখাস্ত করবে না তো? এ কিন্তু চিরস্থায়ী চাকুরী, সে কথা আগেই বলে দিচ্ছি দীপালী।'

আদরের স্বরে তার দীপালী নামটিকে ভেঙে নিয়ে হিমাংশু কত রূপই না দিত! সেই সব নাম আর যে কণ্ঠ সেই নাম ডাকতো, এখনও মৃত্যু সাগর পার হয়ে তারা দীপালীর অভিভূত শ্রবণে ফিরে আসছে। সেই নাম, সেই কণ্ঠের আদর সমস্ত কি মিথ্যা হয়ে যেতে পারে?

মনে পড়ে, ছোট ছাদটিতে সকলে আনন্দ ক'রে একসঙ্গে খাওয়া। তারপর সাড়ে ন'টার শোতে দীপালীকে নিয়ে হিমাংশু গিয়েছিল চিত্রগৃহে। অনেক রাত্রে যখন তারা ফিরছিল, তখন দীপালীর রক্তস্রোতে যৌবনের জয়গীতি বেজে উঠেছিল হিমাংশুর নিবিড় আলিঙ্গনে, হিমাংশুর অধীর চুম্বনে।

সেই সব দিন কোথায় গেল? দীপালীর রঙ্গমঞ্চে বর্ণমুখর দিনগুলি নির্বাণ ক'রে কোথায় চলে গেল শিল্পী? ক্ষণিকের জন্য এসে জীবনব্যাপি দুঃখের মধ্যে রঙীন ইন্দ্রধনু এঁকে দেবার কি প্রয়োজন ছিল। অবশিষ্ট দিনগুলি তার কাটবে কি নিয়ে? স্মৃতি? তাও তো এ খবরের কাগজের কয়েকটি কথায় বিষ হয়ে উঠতে চায়।

বিবাহ প্রস্তাব হিমাংশু ধীরভাবে সামাজিক ভব্যতা অনুসারে করে নি সত্যি। কিন্তু প্রয়োজন ছিল না। দীপালী জানত এ প্রেমে বিচ্ছেদ নেই এবং হিমাংশু কুমার।

মনে পড়ে, দীপালীর ভাবী স্বামী হিমাংশু, এ কথা জেনে এনার ভাব-বৈলক্ষণ্য। হিমাংশুর দেবোপম মূর্তির দিকে তাকিয়ে এনার ঈর্ষার নিশ্বাস আজও মনে পড়ে। সেই সাপের মত জলন্ত নিঃশ্বাস। বেশ ছিল দীপালী। হ্যাঁ, হিমাংশু না থাকলেও দীপালী বেশ ছিল। এনার সহ্য হ'ল না। খুঁজে বার ক'রে পাঠিয়েছে এই শব্দভেদী বাণ। এনাকে দীপালী অভিসম্পাত দিল অতি কুশ্রী ভাষায়, বস্তীর মেয়েদের মুখে যে ভাষা সে দুই একদিন শুনেছে।

পোনের দিন আগে দীপালী ভেবেছিল হিমাংশুর বিয়োগের ব্যথা তার কি ক'রে সইবে? আজ দীপালী বুঝেছে সন্দেহের এ যন্ত্রণা চিরবিরহের থেকেও কষ্টকর। হিমাংশু চলে গেছে। তাতে বেদনা আছে, অশ্রু আছে, কিন্তু সঙ্গে ছিল পূর্বস্মৃতির সুখপ্রবাহ, হারাণো প্রেমের ব্যাকুল আরতি, শ্রদ্ধা-ভালবাসার চিরস্মরণ।

সেই স্মরণসৌধ এনার নিশ্বাসে কাঁপছে। এই বুঝি ভেঙে পড়ে! সর্বনাশী এনা!

কিন্তু, এনার দোষ কি? কাগজে ছাপিয়ে কাহিনী রচনা করে নি এনা। সে সংগ্রাহক মাত্র। চরম সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াও, ভুলে থেক না হারাণো দিনের রোমন্থনে।

কি হয়েছে যেন? হিমাংশু মারা গেছে, না? ওঃ! কিন্তু, না না। আরও

ভীষণ কিছু ঘটেছে। হিমাংশুই মিথ্যা। হিমাংশু বিবাহিত। এই যে কাগজে লিখেছে ; তপতি দত্ত ছিলেন মিসেস হিমাংশু ঘোষ !

এ খবরই মিথ্যা, শত্রুর কারসাজি। কিন্তু, তপতী নামটা শোনা যে ! হিমাংশুর মুখে শোনা। মনে পড়ে একদিনের কথা। কথাপ্রসঙ্গে হিমাংশু বলে ফেলেছিল, এবার শান্তিনিকেতনে গানের আসর বিশেষ জমে নি। তপতী গিয়েছিল না কি না !

কৌতূহলাক্রান্তা দীপালী পশ্ন করেছিল, তপতী কে ?

হিমাংশু অতি স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিয়েছিল, আমার এক আত্মীয়া।

আত্মীয়া ! আত্মীয়াই বটে—আত্মার আত্মীয়া ! বিদুষী, বিখ্যাত দত্তপরিবারের কন্যা। তাইতো ! হিমাংশু ঘোষ কি কর্পোরেশন স্কুলের দীপালী বোসকে গৃহে বরণ ক'রে আসন দিতে পারে ? দীপালীর কাছে হিমাংশু ঘোষ দিবারাত্রি কাটাতে পারে ; দীপালীর বিশ্বস্ত মনকে প্রেমের খেলায় বাধন দিতে পারে, দীপালীর অধরে চুম্বন করতে পারে ;—তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু বিবাহ ? তখন হিমাংশু ঘোষের ছুটতে হয় তপতী দত্তর কাছে ! দীপালী অসহ্য ক্রোধে নিজের শাড়ির অঞ্চলটা টেনে ছিঁড়তে লাগল। ঠিক মিলেছে ! তপতী হিমাংশুর আত্মীয়া !

হিমাংশু প্রত্যহ তো তারই কাছে আসতো ! তবে, কখন সে ভাবী পত্নীর গৃহে যেত ? এই যে কাগজে লিখেছে, এ কথা তো তা হ'লে সত্য নয়। তবে, দীপালী ভ্রূকুঞ্চিত করল—আসতো হিমাংশু একটু রাত ক'রে। সন্ধ্যার সময়ে সে না কি ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতো। সেই সন্ধ্যা তা হ'লে প্রকৃতপক্ষে সে কাটাতো তপতীর কাছে। যখন পৃথক বাসস্থানে রোগিণীর কাছে ভদ্রভাবে থাকবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যেত তখনি হিমাংশু আসত একটি সরলা—নির্বোধ নারীর সাহচর্য পেতে। এখানে তো কেউ তার থাকাটাতে সভ্যতার মাপ-কাঠিতে মিলিয়ে দেখতো না। এই দরিদ্র সংসারে হিমাংশুর আচার-ব্যবহার কেউ ভদ্রতার তুলাদণ্ডে ওজন ক'রে দেখে নি—প্রেমবিহ্বলা তরুণী তার মুখের দিকে চেয়ে জগৎ ভুলে যেত, দূর থেকে আশীর্বাদ করতেন বৃদ্ধা মা। তিনি হিমাংশুকে নিজের ভবিষ্যৎ জামাতারূপে ধ্রুব নিশ্চয় জেনে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

পুরুষ এত প্রতারক ! হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে দীপালী শতধা হয়ে টেবিলের

ওপর লুটিয়ে পড়লো। প্রিয়কে হারাণোর চেয়ে প্রেমকে হারাণো বোধহয় বেশী বেদনার।

কান্নার শব্দে মা ছুটে এলেন, আঃ দীপু, আবার কাঁদছিস? যা হবার হয়ে তো গেছেই। কাঁদলে সে তো আর ফিরে আসবে না। বেশ তো উঠেছিলি সেরে, আবার কেন কান্নাকাটি করছিস?

দীপালী মায়ের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। সে আর ফিরে আসবে না! যদি সে একবার ফিরে আসতো! একবার দীপালীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে যেত—কাগজে যা প্রকাশিত হয়েছে সমস্ত মিথ্যা, সে দীপালীকে যা দিয়েছে তাই সত্য।

জানালার ধারে দাঁড়ালো দীপালী। সেই চাঁদ। যে চাঁদের নাম নিয়ে তার আকাশে চাঁদ উঠেছিল, সেই চাঁদ গেল কোথায়? প্রতিদিনকার আদর-সোহাগের স্মৃতি দেহকে আজও বিয়োগ-বেদনার মধ্যেও চঞ্চল ক'রে তুলতে চায়। এই সাংবাদিকের লেখনী মিথ্যা। তপতী কেউ নেই, থাকতে পারে না। হিমাংশুর মনের মধ্যে আসন একা দীপালীর।

সেই রাত্রি! যেদিন সে হিমাংশুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। হিমাংশুর মা-বাবা কিছুদিন কাশী ছিলেন পুণ্য করতে। সেই অবকাশে হিমাংশু দীপালীকে নিজের বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল গোপনে। এক এক সময় এত গোপনতা দীপালীর ভাল লাগতো না। কেন, প্রেমের সম্বন্ধ তো পৃথিবীর সমস্ত সম্বন্ধের ওপরে, তার মধ্যে কি গোপনতা থাকতে পারে? কোথাও বিশেষ যেত না তারা বেড়াতে, প্রতি সন্ধ্যায় দীপালীর ছোট ফ্ল্যাটে অন্তরঙ্গ হয়ে থাকতো। মিথ্যা হিমাংশুর সব অভিনয়। তাকে কেউ দীপালীর সঙ্গে দেখে ফেলে, এই ভয়ে সে দীপালীকে নিয়ে কোথাও যেত না, দীপালীকে সে তাই প্রকাশ্যে নিজের বাড়িতে মা-বাবার কাছে নিয়ে ভাবী পত্নীর মর্যাদা দিতে পারে নি। তখন সে-সব দীপালীর চক্ষে অতি সাধারণ ব্যবহার মনে হত, এখন সে-সবের নতুন অর্থ এনে দিল কালির কয়েকটি অক্ষরে। মিথ্যা, সব মিথ্যা! সত্য তপতী দত্ত।

সেই রাত্রিটি—হিমাংশুর ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যে এত, সেটা দিপালী কল্পনাকে যথাসাধ্য ঘোড়দৌড় করিয়েও পূর্বে আয়ত্তে আনতে পারে নি। সঙ্কুচিতা দীপালীকে সম্বোধন ক'রে হিমাংশু সেদিন বলেছিল, কি দিলু, বাড়িঘর পছন্দ হয়?

সে কি মিথ্যা? না, না, সেই রোমাঞ্চময় প্রেম ভালবাসা, নিবিড় আদর-

সোহাগ মিথ্যা হতে পারে না। তা হ'লে জগৎ মিথ্যা। দীপালী সত্য নয়, এক-কালে হিমাংশু ঘোষ বলে যে ছিল, সে-ও সত্য নয়।

দীপালী ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগল ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে। মুখে তার জয়ের হাসি। তপতী, তুমিই মিথ্যা। সেই রাত্রিটি, প্রেমাকুল কামনাতপ্ত, বাসনামুখর রাত্রিটি! দীপালী হিমাংশুর মধ্যে সেদিন কোন ব্যবধান ছিল না, শেষ ব্যবধান লুপ্ত হয়েছিল বিস্মরণের বন্যায়। শয়নকক্ষের পালঙ্কে আলুন্ঠিতা দীপালীকে কম্পিত কণ্ঠে হিমাংশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চির বিশ্বস্ততার।

হিমাংশু তারই—এই বোধ সেদিন সম্পূর্ণ জন্মলাভ করেছিল। সেদিন ভুলে যেতে পেরেছিল দীপালী সংশয় সন্দেহ। আর সমস্ত দিন মিথ্যা হয়ে যাক না, একটি দিনের স্মৃতিই সারা জীবনের পাথেয় হবে। দীপালী যাবে না জনারণ্যে, দীপালী সত্য মিথ্যার যাচাই চাইবে না। নিভৃত গৃহে দীপালী থাকবে তার অন্তর নিয়ে, অন্তরের সঞ্চয় নিয়ে। হিমাংশুর পাণি অন্যের হোক না—প্রেম তো দীপালীর একার ছিল।

কিন্তু 'আদর্শ প্রেমিক'! সে প্রেম পেয়েছিল তো বিবাহিতা পত্নী! আচ্ছা, চিররুগ্না মানে কি? টি-বি নিশ্চয়। তাই পৃথক বাসস্থান। কিন্তু এম-এ পাশ? তখন হয়তো বিদুষী কুমারী দত্ত সুস্থই ছিলেন। কিম্বা বিবাহের পরে সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তা হ'লে কৃতিত্ব আছে। নিশ্চয় প্রেমমূলক বিবাহ হয়েছিল। ওঃ! রোজ যেত হিমাংশু সেখানে? কেন, কেন? বা, ভালবাসে যে! তাই তরুণ বয়সে অত অর্থশালী হয়েও অন্য কাউকে তপতীর জায়গায় বসাতে পারে নি। তাই বিবাহ-জীবন সে যাপন ক'রে চলেছিল কুমারের মত। তাই বুঝি মাঝে মাঝে হিমাংশুর চোখের দীপ্তি ম্লান ক'রে দিত বিষাদে। তাই হিমাংশুর অধরের হাসিতে উৎসাহ ছিল না, গতিতে ছিল ক্লান্তি। এই দৃষ্টি দিয়ে দীপালী কোনদিন হিমাংশুকে না দেখলেও অবচেতন মন আলোকচিত্র গ্রহণ ক'রে রেখেছিল। আজ সেই সব ছবি সে ডেভেলাপ ক'রে নিচ্ছে। গান শুনতে ভালবাসতো তপতী। তপতী বলেছিল কি না, শান্তিনিকেতনের গানের আসর ভাল হয় নি। তা হ'লে তপতী শয্যাগতভাবে অসুস্থ ছিল না। তা হ'লে তপতী উঠে গান শুনতেও যেত। তবে? ও, অসুখের জন্য বোধহয় স্বামীসঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল। তাই পৃথক বাসস্থান। আদর্শ স্বামী, আদর্শ প্রেমিক! তা হ'লে আগাগোড়াই কি দীপালীর ভাগ্যে মিথ্যার বেসাতি? কেন, কেন বলে নি

ও? বিবাহিত জানলেও কি দীপালীর ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমতো? তবে বলে নি কেন? কেন এত মিথ্যা দিয়ে প্রেমকে মলিন ক'রে রেখে গেল? প্রেমও কি দীপালী পেয়েছে!

কি যন্ত্রণা! হিমাংশু কেন কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে এমনভাবে চলে গেল? এখন সারাজীবন মথিত হবে দীপালী এই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে।

কি করবে সে এখন? একমাত্র যে লোক তার সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা ক'রে তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারতো, সে আজ চাওয়া-পাওয়ার বহুদূরে চলে গেছে। তার স্মৃতিসুখও যে আজ অবশিষ্ট থাকছে না দীপালীর!

হিমাংশু, একবার ফিরে এস। বলে যাও আমাকে যে ভালবেসেছিলে সে সত্য, এই সখের সাংবাদিকের কাহিনীই মিথ্যা। তোমার দীপালী আড়ালেই রয়ে গেল, আর জগতের সামনে তোমার প্রিয়তমারূপে এসে দাঁড়ালো তপতী! কেন এই মিথ্যার প্রতিবাদের পথ তুমি আমাকে দেখিয়ে গেলে না?

দীপালী চেয়ারে স্থির হয়ে বসলো। না, সে মিথ্যা নয়, হিমাংশু মিথ্যা নয়—হ'তে পারে না। মিথ্যা এই তপতী। তাই একে দীপালীর জগত থেকে লুপ্ত ক'রে দিতে হবে।

কাগজটা টেনে ছিঁড়তে যেয়ে কি ভেবে দীপালী নিবৃত্ত হ'ল। ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা বাজে। টেবিলের ওপর রাখা হিমাংশুর ছবির পায়ের কাছ থেকে হিমাংশুরই দেওয়া পার্কার কলমটা তুলে নিয়ে দীপালী তপতীর নামটা কেটে দিয়ে নিজের নামটা বড় বড় ক'রে বসালো। সুবিখ্যাত দত্ত পরিবারের কন্যা কেটে লিখলো 'কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী'।

নিজের কীর্তির দিকে দুই চোখ মেলে চেয়ে দেখতে দেখতে আজ পনেরো দিন পরে দীপালীর অধরে নেমে আসলো হাসি।—অনন্ত তৃপ্তির প্রসন্ন হাসি!

বোকা মেয়ে

নূপুর বড় চিন্তিত। তার মিতাদি আসছেন। অন্ততঃ একদিনের জন্যও মিতাদিকে বাড়িতে এনে সারাদিন রাখতে হ'বে, খাওয়াতে হ'বে। নূপুর এতকাল বোর্ডিং-এ থাকতো। কিছুদিন হ'ল বাবা বদলি হ'য়ে এখানে এসেছেন। বি, এ, পরীক্ষা দেবার পরেই নূপুর বাড়িতে এসে বসেছে।

এক বছর মিতাদি বাইরে ছিলেন। ভাল ক'রে নূপুরকে বি. এ. পরীক্ষা দেবার উপদেশ-অন্তে মিতাদি আমেরিকা পাড়ি দিলেন অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি নিয়ে। মিতাদির প্রিয়তমা ছাত্রী ছিল নূপুর। ভালবাসায় শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর কাছে সরে এসেছিলেন, আত্মীয়া হয়েছিলেন তার।

ফলে নূপুরের জগৎ মিতা মিত্র-ময় হ'য়ে গেল স্বাভাবিক ভাবে। আচারে ব্যবহারে উজ্জ্বল পালিষ মিতাদির। চিরকালের ধারালো মেয়ে। কলেজে শিক্ষাদান তাঁর ধারাকে আরও শান দিয়েছিল, নিষ্প্রভ করতে পারে নি একটুও।

মিতাদি, মিতাদি, মিতাদি! প্রবাসিনী কন্যার চিঠিভরা থাকতো মিতাদির বাখ্যায়। মা-বাবা মিতাদিকে দেখতে ব্যগ্র হয়েছিলেন। মিতাদিও নূপুরের পরিবারের সঙ্গে মিলনেচ্ছু ছিলেন। যোগাযোগ পূর্বে হয় নি।

কিন্তু নূপুর চিন্তিত কেন? কতদিন ধ'রে বাসনা মনের কোণে ছিল, মিতাদিকে অন্তরঙ্গতর পরিবেশে কাছে পাবার জন্য। মা-বাবা, ভাই-বোন দেখবেন চোখ মেলে কাল্‌চার কাকে বলে।

তবু, চিরদিনের আরাধ্য সময় এগিয়ে আসছে, তাতে ভয় কেন? আমেরিকা পর্যন্ত মানসিক ধাওয়া করেছিল নূপুর চিঠির বাহনে। মিতাদি ফিরে এসেছেন। বোর্ডিং-এ উঠে কাজে যোগদান করেন নি এখনও। ভাই-এর বাড়ি উঠেছেন।

খবর পেয়ে নূপুর গিয়ে দেখা ক'রে এসেছে। যদিও, বাড়িতে টেলিফোন নেই, তবু মিতাদির দাদা ঋষিকেশ মিত্রের টেলিফোন নাম্বার সে বয়ে এনেছে। পাশের বাড়ি থেকে টেলিফোন ক'রে সে শুনে নেবে মিতা-দি কবে দয়া ক'রে তাদের বাড়ি পায়ের ধুলো দিতে পারবেন। স্বদেশ-প্রত্যাগত মিতাদি বিশেষ ব্যস্ত আছেন সম্প্রতি। তবে অবশ্যই একদিন তিনি নূপুরের বাড়ি আসবেন। নূপুর বহুদিন থেকেই বলে রেখেছে।

কিন্তু, প্রতিশ্রুতি পেয়ে বাড়ি ফিরে নূপুরের উল্লাস দেখা গেল না। ফুর-ফুরে সিফনের হাল্কা আঁচলের নিচে প্রকাণ্ড আংটিপরা আঙ্গুল মিতাদির শাদা অনাবৃত বাহু। যেন মেমসাহেবের হাত। মিতাদির কাটা কাটা চুল কটা বর্ণ ধারণ ক'রে বাতাসে উড়ছে। রঞ্জিত নখর, অংকিত ভ্রূ ও ওষ্ঠাধর। চিরকালই উনি ফ্যাসানী ছিলেন। আমেরিকার ডলার চাকচিক্য এনেছে।

সব জড়িয়ে মিতাদি যেন কেমন অসাধারণ হয়ে গেছেন। কাছে যেয়ে সহজভাবে আর কি মিতাদিকে পাওয়া যাবে? সেই পূর্বের মিতাদি যেন নেই আর। আগে যেন বেশী ভালো লাগতো। কোঁকড়ানো লম্বা চুলের খোঁপা ঘাড়ে, টাঙ্গাইল-তাঁতের মিহি শাড়ীর জরির পাড় কাঁধ গলা ঢেকে নামতো। পায়ের গোড়ালী কাটাজুতোর ফাঁকে আলতায় টুক্‌টুকে। হঠাৎ মেম মিতাদি পূর্বের সাজসজ্জা আগাগোড়া বদলে ফেলেছেন। নূপুরকে দেখে কেমন বিদেশী গলায় বলে উঠলেন, 'নূপুর যে! ভাল আছ?' যেন নূপুরকে তিনি কোনদিন ভালবাসেন নি। যেন নূপুরকে তিনি আমেরিকা থেকে চিঠি লেখেন নি। যেন নূপুরের চিঠির উত্তরে দেশে ফিরে তার বাড়ি যাবার প্রতিশ্রুতি দেন নি। যেন নূপুর নূপুর নয়, অন্য কেউ।

বাড়ি ফিরে এই নূতন চোখ দিয়ে নিজের বাড়ি-ঘর দেখল নূপুর। হায়, এই বাড়িতে কি ক'রে মিতাদিকে আনবার ব্যবস্থা ক'রে সে নিশ্চিন্ত ছিল? অতি সাধারণ ঘরোয়া গৃহস্থ বাড়ি।

নিজের ঘরখানা তন্ন তন্ন ক'রে দেখল নূপুর। রং-চটা খাট, টিপয়টার কাচ ভেঙে গেছে। বইএর আলমারীর পাল্লা ফাটা। আরও অনেক অনেক গলদ।

নিজের ঘর থেকে অন্যান্য ঘরে অবলোকন ক'রে মনে মনে হিসাব খতিয়ান করলো নূপুর। বাবার ঘরের পাখাখানার বিশ্রী শব্দ হয়। বেয়ারিং না কি, খারাপ হয়ে গেছে। মিস্ত্রী অতিরিক্ত টাকা চাওয়াতে বাবা রাগের মাথায় সারান নি মোটে। খাবার টেবিলের পালিশ-রং উঠে শ্মশানের কাঠ হয়ে রয়েছে। মীটসেফের জালটা ছিঁড়ে হাঁ। হায়, হায়, কেন এসব আগে চোখে পড়ে নি নূপুরের? আজই মিতাদির সঙ্গে মোলাকাৎ ক'রে এসে নিজের বাড়ির অন্যরূপ নূপুরের চোখে ধরা পড়ছে।

দাদা গেঞ্জি গায়ে, ফেরতা দিয়ে কাপড় প'রে, হটহট ক'রে খালি পায়ে সর্বদা বেড়ায়। বললেও কথা শুনবে না। বাবা চীৎকার ক'রে কথা বলেন।

তবে তিনি অফিসেই থাকবেন এই রক্ষা। আর মা? হাতে পায়ে বল পেল না নূপুর। দাদা বাবার মত মা'কে তো বেমালুম গাপ্ করা যাবে না! তিনিই যে হোস্টেস্।

ভাই-বোনদের প্রতি ভগিনী-জনোচিত স্নেহের উদয় হ'ল না নূপুরের। ছোট বোন দারুণ বাচাল আর পাকা। কখন কি ঠাস্ ঠাস্ ক'রে বলে বসে, ঠিক নেই। ছোট ভাইটার দিকে চেয়ে নূপুর ভাবল, একে সে সুন্দর ভেবেছিল কি ক'রে? অতিরিক্ত মোটা, আবার তেমনি নোংরা।

আশ্চর্য, আশ্চর্য! এই বাড়িতে মিতাদিকে আনবার কথা ভেবেছে সে? দিনের পর দিন ভেবেছে! একবারও কি অসঙ্গতি চোখে ধরা পড়ে নি তার? মিতাদি তাদের বাড়িতে এসে অস্বস্তি বোধ করবেন, ঘৃণা করবেন। এর চেয়ে মিতাদি একেবারে না এলেও নূপুব সহ্য করতো। মনশ্চক্ষে দেখল নূপুর, মিতাদির রঙিন অধরে বক্র হাসি অনুকম্পার।

যথাকালে টেলিফোন মারফৎ মিতাদির আগমন-বার্তা ঘোষিত হ'ল। তিনি কাল আসছেন।

ফাঁসির আসামীর মত মুখ নিয়ে নূপুর ভঁাড়ার ঘরে মায়ের কাছে এল! মা তখন ভাদ্র মাসের তালের বড়া ভাজছেন বসে বসে তোলা উনুনের ধারে।

'মা, কাল মিতাদি আসবেন।'

'বেশতো! এলে জেনে নেব, তোকে কেমন ক'রে তিনি গুণ করেছেন। তুই একদিনও মিতাদির নাম না ক'রে থাকিসনে।'

মায়ের লঘুতায় নূপুর বিরক্ত হ'ল। এত বয়সে ছ্যাবলামো গেল না ওঁর? মিতাদি কি সংযত, গম্ভীর! মিতাদি মাকে দেখে কি মনে করবেন কে জানে? ঘরের কাজ ক'রে নোংরা হাত কাপড়ে মোছা মায়ের অভ্যাস বার মাসের। আরও বিস্তর খুঁৎ আছে।

'বেশতো বললে! জান, মিতাদি সবে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন?'

'সে আর জানবো না কেন? তুই তো দিনে চারবার বলছিস? তাতে কি?'

মায়ের ভাবগতিক দেখে নূপুর একটু দমে গেল—'এই, আমাদের বাড়িঘর তো তেমন সাজানো-গুছানো নয়। উনি কি ভাববেন?'

'কি ভাববেন, শুনি? জেনেই তো আসছেন এটা গেরস্ত বাড়ি, লাট বেলাটের অট্টালিকা নয়।'

'ঘরদোর ভাল ক'রে না সাজালে নয়।'

'সেতো যে-কোন অতিথি এলেই করতে হয়।'

মায়ের গলার স্বরের গতি ভাল নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নূপুর বুঝেছে যে, এবার প্রলয়ের হাওয়া বইতে পারে! কথার মোড় সে ফেরাল। মা খাওয়াতে ভালবাসেন। নূপুর তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'কাল কি কি রান্না হ'বে?'

এবারে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হ'ল,—'ভাবছি এই তালটা দিয়ে একটু তালক্ষীর ক'রে রাখব।'

নূপুর সভয়ে বলল, 'না, না, ওসব গেঁয়ো খাবার তুমি করতে যেও না।'

মা অবাক হ'লেন,—'দূর বোকা মেয়ে! তোর আমেরিকা-ফেরৎ দিদিমণির মুখে মাংস-টাংসের চেয়ে তালক্ষীর, পুলিপিঠে, এ সবই রুচিবে বেশী।"

এবারে নূপুরের টার্গেট দাদা। দাদা ন্যালাক্ষ্যাপা হ'লেও শিক্ষিত আছে। শিক্ষিতার কদর বুঝে বাড়িঘর সংস্কারে সে সাহায্য করতে পারে। সোজাসুজি কথাটা তো পাড়া যায় না! নূপুর দাদার মাথার শিয়রে গুছিয়ে বসলো। দাদা চিৎ হয়ে খাটে শুয়ে একখানা মস্ত ইতিহাস পড়ছিল।

'আচ্ছা দাদা, তুমিও তো কলেজে পড়াও'—সাবধানে জমি মেপে মেপে পা ফেলছে নূপুর,—'তাহ'লে মিতাদি যেমন সরকারী টাকায় আমেরিকা বেড়িয়ে এলেন, তুমি পারো না কেন?'

'রাখ্ তোর মিতাদি। আমি যা করতে চাই, তাই যদি পারি তবে আর কিছুই পারতে হবে না। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস যদি শেষ ক'রে যেতে পারি, তাহ'লে জীবনে কাজ করলাম বুঝবো। আমেরিকা ইংলণ্ড নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। নিজের দেশকে না চিনে আমেরিকা যাবার মানে হয় না।'

নূপুর বিপদ বুঝলো। এ সময়ে দাদার মুখ লাল হয়ে ওঠে, গলার স্বর চড়ে যায়। উত্তেজিত অবস্থায় ঘরে পাইচারি করে আর নিজের মনে বকে। লেখা

পাতাগুলো বাতাসে ওড়ে, বইগুলো চলাফেরার ধাক্কায় গড়িয়ে যায়। সুতরাং, আশাশূন্য মনে নূপুরকে উঠে যেতে হ'ল।

ছোট বোন মন্দিরার কাছ থেকে কিন্তু অপ্রত্যাশিত সাহায্য মিললো। দিদির চির-শত্রু পিঠোপিঠি বোন দিদির হাতে হাত মেলালো।

'যা বলেছ দিদি! এ বাড়িতে কাউকে আনা যায় না। লুইকে এনে যা বিপদে পড়েছিলাম। সর্বক্ষণ ও নাক তুলেই রইল।'

বোনের ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু লুই-এর স্নবারির বিষয়ে, অন্য সময় হ'লে, নূপুর কোন কড়া মন্তব্য করতো। কিন্তু, আজ সে সাহস পেল না। বোনের সহায়তা চাই তার।

দুই বোনে মিলে ঘরে-কুটে বাড়িখানা ঝেড়ে সাজাবার চেষ্টায় হয়রান হ'ল। কপালগুণে কায়দা-দোরস্ত পুরণো চাকরটি ছুটি নিয়েছে। অথর্ব ঝি আর রাঁধুনে বামুনের সাহায্যে যা করা গেল।

মীটসেফটা ভাঁড়ারে চালান ক'রে দিয়ে খাবার ঘরের টেবিল তারা পরিষ্কার চাদরে ঢাকলো। নূপুরের ভাঙা টিপইখানা অপসারিত ক'রে দাদার ঘরের মার্বেল ত্রিপদী এনে রেখে ফুলের তোড়া সাজালো। ফাটা আলমারি সিল্কের পর্দায় ঢাকলো। এ ঘরেই প্রধানতঃ থাকবেন মিতাদি। সুতরাং গোটা বাড়ি ভেঙে ভাল জিনিসপত্র এনে এ ঘরখানা সাজানো হ'ল। খাবার ঘরে যেতে যতটুকু চোখে পড়বে মিতাদির, সেটুকুও এই ভাবে সংস্কৃত হ'ল। সারা বাড়ি ধুলোমুক্ত ক'রে, মায়ের পা ধ'রে তাঁকে একখানা ভালো শাড়ী পরিয়ে, নূপুর ঘড়ির দিকে চেয়ে ভগবানের নাম জপতে লাগলো।

অবশেষে এলেন তিনি—যাঁর প্রত্যাশায় এত আন্দোলন। আরও প্রখর পালিশ, আরও নতুন মিতাদি। নীল রেশমের আঁচল থেকে পায়ের নখে আমেরিকার পালিশ।

নূপুরের ঘরে বসলেন। হাজার বার তদারকে যেতে লাগলো নূপুর, সব ঠিক আছে তো?

মায়ের গেঁয়োপনা ছোট বোনের বাচালতা অসহ্য লাগলেও ধর্মতঃ তাদের ওপর রাগ করা যায় না। ঘরে সমস্ত সুখাদ্যগুলি মা রান্না করছেন নিজের হাতে। এখনও আগুনের আঁচে মুখ তাঁর লাল হয়ে আছে। নখের কোণে হলুদ

লুকনো। মন্দিরা জিনিসপত্র টানাটানি করতে যেয়ে পা কেটে ফেলেছে, পায়ে পটীবাঁধা। এদের ওপরে রাগ করা কি যায়? শুধু অসহায় ক্ষোভে নূপুরের মুখে সুখাদ্য বিষ হয়ে গেল।

মিতাদির যে একটুও ভাল লাগছে না, নূপুর বেশ বুঝতে পারলো। সে একটু বিলিতি গোছ রান্না করতে বলেছিল; তা না ক'রে মা কেবল কচু ঘেঁচু রান্না করেছেন নিজের মতে। আমেরিকাফেরৎ মুখে কি ক'রে ভাল লাগতে পারে? মিতাদি পারতপক্ষে কিছুই খেলেন না। ছুঁয়ে ছুঁয়ে সরিয়ে রাখলেন, নূপুর স্পষ্ট দেখলো। মন্দিরার দিকে মাঝে মাঝে এমন ভাবে উনি তাকিয়ে রইলেন যেন প্রথম এ বয়সের মেয়ে দেখছেন। ছ্যাবলামি মন্দিরার কোন উপায়ে বন্ধ করতে না পেরে নূপুর অস্বস্তিতে মরে গেল।

ইলিশের পাতুরী মুখে ঠেকিয়ে মিতাদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি গঙ্গার ইলিশ?'

নূপুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মন্দিরা কল্‌কল্‌ ক'রে উঠল, 'হ্যাঁ, মিতাদি। জানেন, কি মজা হয়েছে? ঠাকুরকে মা মাছ কিনতে দিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। যদি সে বাজারের ইলিশ কিনে মুখে ল্যাজে দড়ি বেঁধে গঙ্গার ইলিশ বলে মাকে ঠকায়? দাদাকে পেড়াপীড়ি ক'রে বাজারে পাঠিয়েছিলেন মা। দাদার তো কি রাগ!'

মরমে একেবারে নিশ্চিহ্নে লুপ্ত হ'ল নূপুর। ছি, ছি, এ ধরণের কথা বাইরের লোককে বলে না কি কেউ? যে খাচ্ছে, তারই খাদ্য আনতে অন্যে রাগ করেছে এ কথা জানানো দারুণ অসভ্যতা। কি করবে নূপুর? বাড়ির সংস্কার করেছে, কিন্তু বাড়ির মানুষের সংস্কার করবে কি ভাবে?

পুলিপিঠে জোর ক'রে খাওয়াতে যেয়ে মা মিতাদির কাপড়েই পিঠের দুধ ঢেলে ফেললেন। ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে খোকন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে খাবার ঘরে ঢুকলো। অথর্ব ঝি ওকে স্নান করাতে যেয়ে বাথরুমে ফেলে দিয়েছে। অবশ্য, বাইরের লোককে খাবার ঘরে খেতে দেখে খোকন তক্ষুণি পালিয়ে গেল। কিন্তু, হায়, তার আগেই যে তার নগ্ন ও নোংরা রূপ মিতাদি নির্নিমেষে দেখে নিলেন!

নূপুরের ঘরে আহারান্তে বসলেন মিতাদি। কোন মতে আস্ত বাড়ির ছোঁয়াচ

থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে এনে, তাঁকে গুটিয়ে এনে নিজের সজ্জিত ঘরে সাজিয়ে নূপুর সাময়িক সুস্থতা লাভ করলো।

এলাচ মুখে মিতাদি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার দাদা বাড়ি নেই, নূপুর ?'

নূপুর আম্‌তা আম্‌তা ক'রে উত্তর দেবার আগেই উনি আবার বললেন, 'তোমার দাদার কলেজের একজন প্রফেসার আমাদের সঙ্গে বৃত্তি পেয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ওঁরি মুখে শুনলাম তোমার দাদা ভারী আশ্চর্য রকম একখানা ইতিহাসের বই লিখছেন।'

এরপরে দাদাকে না আনলে চলে না। পায়ে ধরার মত সেধে সেধে নূপুর দাদাকে এ ঘরে ডেকে আনলো। কিন্তু, কিছুতেই দাদা সাজগোজ ক'রে এল না।

দাদাকে বসিয়ে নূপুর একবার আবার খবরদারিতে গেল। সন্ধ্যায় মিতাদির দাদা গাড়ি ক'রে মিতাদিকে নিতে আসবেন। তার আগে একবার ওঁকে ভালো ক'রে চা খাইয়ে দিতে হ'বে।

ফিরতে একটু দেরীই হ'ল। নূপুর দেখলো, ইতিমধ্যে মিতাদি ও দাদা বেশ গল্পে জমে গেছেন। মিতাদি অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে কথা বলছেন, হাসছেন। দাদা হা-হা হাসিতে ঘর ফাটিয়ে, চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে কাকের বাসা বানিয়ে, অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। মহিলার সামনে শালীনতা নম্রতা মোটেই নেই। দাদার জন্য রীতিমত লজ্জা হোল নূপুরের।

নূপুরকে দেখে আগের কোন তর্কের সূত্র ধ'রে মিতাদি প্রস্তাব করলেন, 'আমার কথায় আপনি হাসছেন ? আপনার বোন তো এসেছে। এ বিষয়ে ওকেই না হয় জিজ্ঞাসা করুন।'

দাদা ঘর ফাটিয়ে হাসলো, 'কাকে জিজ্ঞাসা করবো ? নূপুরকে ? ও হচ্ছে দারুণ বোকা।'

গাড়ি ছেড়ে দেবার আগে মিতাদি মুখ বাড়ালেন, 'দুইচার দিনের মধ্যেই আমি হস্টেলে যাচ্ছি, নূপুর। ওখানে যেয়ে চিঠি দেব। তুমি এসো।'

নূপুর কিন্তু বুঝলো এ নিছক ভদ্রতা। সারাদিনের অতিথির অবাঞ্ছনীয় পরিবেশ ছেড়ে যাবার মুখে সান্ত্বনা। মিতাদিকে আরও নূতন লাগছিল। কেমন যেন অন্যমনস্ক উনি। কত দূর হয়ে গেছেন !

আস্তে ফিরে এল নিজের ঘরে নূপুর। কত আশা দিয়ে সাজানো ঘর

মিতাদির ভালো লাগে নি। সে কি করবে? কি করতে পারতো আর নূপুর? সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা তো করেছে।

চিঠি পেতে একদিন, দু'দিন ক'রে দিন চলে যেতে লাগলো। নূপুরের মন যেন বুকের বাসায় একটা মরা পাখির মত ভারী হয়ে পড়ে রইলো। মিতাদি যে কত অগ্রাহ্য করেছেন তাদের যৎসামান্য আতিথ্যের চেষ্টা, চিঠির বিলম্বই বলে দিল। আমেরিকার ভদ্রতা সহ্য করিয়েছিল মিতাদিকে নূপুরের বাড়ি ও পরিবারের অসভ্যতা। কিন্তু, বিরক্ত তিনি হয়েছেন এমন বাড়ি-ঘরে তাঁর মত মেমসাহেবকে নিমন্ত্রণ করবার স্পর্ধায়। নূপুরকে আর ভাল তিনি বাসবেন না।

সেই পাতলা সুন্দর নীল শাড়ীখানা! মা পিঠে ফেলে হয়তো একেবারেই নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। রাগ হয়েছে মিতাদির। মন্দিরার ছ্যাবলামী, খোকনের নোংরামি! দাদা মিতাদির খাবার জন্য মাছ আনতে রাগ করেছিল শুনে মিতাদি চটেছিলেন। তারপরে দাদা এমন লোফারের বেশে সামনে বার হ'ল!

দাদাকে যেন অত খারাপ কোনদিনই দেখে নি নূপুর। চুলগুলো হাত চালিয়ে এলোমেলো করছে ক্রমাগত, পায়ে জুতো নেই, অসভ্যের মত হাসছে, ক্রমাগত কথা বলছে।

তবে বাবার কেস্‌টা ভালই হয়েছে—পাঁচ মিনিট আলাপ অফিসে যাবার মুখে। অফিসের ভদ্র পোষাকে ছিলেন উনি। কিন্তু, বাবার ভদ্র আলাপও মাটি ক'রে দিল বসবার ঘরের পাখার অভদ্র শব্দ।

কি হ'বে আর ভেবে? নূপুরের ভাগ্যে যা ছিল হয়েছে। ওঃ, কেন মিতাদিকে বাড়িতে আনবার দুর্বুদ্ধি নূপুরের হয়েছিল!

অবশেষে চিঠি এল। মুঠোয় খামখানা লুকিয়ে নূপুর সোজা ঘরে চলে এল। মিতাদি যদি বিশেষ রাগের কথা কিছু লেখেন, মা বা মন্দিরাকে জানতে দেওয়াটা নিষ্ঠুরের মত কাজ হ'বে। হাজার হোক যথাসাধ্য খেটেছে দু'জনে।

স্নেহের নূপুর,

তোমাকে চিঠি লিখতে কয়েকদিন দেরী হয়ে গেল। কারণ, দাদার বাড়ি থেকে হোস্টেলে ফিরে কলেজে যোগদান করলাম।

সেদিন তোমার বাড়ি সারাদিন থেকে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। সে আনন্দ

ভুলবার নয়। তোমার বাড়ি তোমার উপযুক্ত পরিবেশ। তোমার মা বাঙালী মায়ের আদর্শ। তাঁর রান্না আমেরিকার অখাদ্য-খাওয়া মুখে কি যে ভালো লাগছিল! কম খেতে খেতে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। তাছাড়া, একসঙ্গে অত সুখাদ্য চোখেও দেখি নি বহুকাল। তাই যা খেতে পারি নি, তার শোকে আপশোষ হচ্ছে। এর পরে তোমার মায়ের কাছে যেয়ে রান্না শিখে আসবো। তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।

মন্দিরাকে বড় ভাল লাগলো। এই বয়সে আজকালকার কোন মেয়ে অত সরল, অত সহজ থাকে না। ঠিক তুমিও অমনি ছিলে।

খোকনের খবর কি? লোকে বলে আমাদের দেশের বাচ্চারা রুগ্ন দুর্বল হয়। আমি তো বিদেশেও অত সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ছেলে দেখি নি। ওকে আমার কথা বোল।

নূপুর, ভারতবর্ষের বিশেষত্ব যা, সবই তোমার বাড়িতে আছে। পশ্চিমের মূল্য-বোধ আর আমাদের মূল্য-বোধ এক নয়। আমাদের আতিথ্য, আন্তরিকতা সারল্য আমাদের পরিবারের মধ্যে অকপট ভালবাসা আমাদের নিজস্ব বস্তু। বাইরে থেকে আমরা বাইরের যা-কিছু বয়ে নিয়ে আসি, আমাদের মনের খাদ্য দেশ ছাড়া কেউ যোগাতে পারে না।

হ্যাঁ, ভালকথা, যেদিন তুমি আমার এখানে আসবে, তোমার দাদাকে সঙ্গে ক'রে এনো। উনি কয়েকখানা বইএর কথা বলেছিলেন, আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি।

আমার স্নেহ ভালবাসা নাও।

মিতাদি

নূপুর আনন্দে নেচে উঠল। মিতাদির এত ভালো লেগেছে? অযথা সে ভেবে মরছিল! এই তো, আজ শনিবার সন্ধ্যায় বাবা মা আর মন্দিরাকে সিনেমায় নিয়ে গেলেন। মন খারাপের জন্য নূপুর মাথাধরার অছিলায় গেল না। কি বোকা সে। মিতাদি তাকে ভালবাসেন, তার পরিবারকে ভাল তো লাগবেই তাঁর।

এমন খবর কাকে দেওয়া যায়? বাড়িতে কে আছে? দাদার ঘরে এল নূপুর। মাথা নামিয়ে তখনও লিখছিল দাদা। 'দেখ দাদা, মিতাদির চিঠি। খুব ভালো লেগেছে ওঁর সেদিন। দেখ দাদা, তোমার জন্যে বই এনে রেখেছেন!

সবই আমার জন্যে। আমাকে মিতাদি এত ভালবাসেন যে, সবাইকে ভালো লেগেছে আমার আত্মীয় বলে! না? দেখ, তুমি আমার দাদা, তাই তোমাকে যেতে লিখেছেন'—

দাদার রুক্ষ, পাণ্ডিত্যদীপ্ত মুখে সরস আভা পড়লো। শক্ত পুরুষালী গাল যেন একটু লাল। অন্যমনস্ক, উদাসীন দৃষ্টি হাসির ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

দাদা নূপুরের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'বোকা মেয়ে!'

কবিতার মত

বসন্ত এসেছে, বসন্ত এসেছে! প্রতি বছর আসে বসন্ত, দক্ষিণ হাওয়া। এ তথ্য নিয়ে বহু মাতামাতি হয়ে গেছে। কাজল আর গতানুগতিক হতে চায় না। তবু মনে পড়ে যায় কত কথা! হঠাৎ সমীরণের স্পর্শ বহন ক'রে আনে পুলকের প্রবাহ। টেনিসনের সুপ্রাচীন লাইনটি মনে প'ড়ে যায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও —'বসন্তে যুবকের মানস লঘু-প্রবাহে প্রেমের চিন্তার প্রতি বিচরণশীল।'— 'লক্‌সলি হল্'—কাজল অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, যেন তার কন্‌ভেণ্ট কলেজে শিক্ষয়িত্রী পড়া জিজ্ঞাসা করেছেন।

আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে লম্বা বেণীতে সোনালী জরির গুচ্ছ বন্ধন করতে করতে কাজল ভাবল, কি পোষাক পরা যায়? বেণীর গুচ্ছে চোখ ছিল। আপনা থেকে চোখের সামনে ভেসে উঠল—সোনার জরি-ডুরি সোনালী শাড়ী—মসৃণ রেশমের ভাঁজ খুলে গেল, আলপনার মত রেখাচিত্র লালপাড় কাজলের অঙ্গুলি প্রান্তের নখররাগ, অধরের তুলীকৃত রক্তিমাকে স্মরণ করিয়ে দিল। বাতাসে অদৃশ্য শাড়ী উড়তে লাগল কাজলের বেণীর সঙ্গে। একটি সোনালী স্যাটিনের জামা যেন শূন্যে ভাসতে ভাসতে স্থির হয়ে দুলতে লাগল কাজলের চোখের সম্মুখে। নিচে ছবি ভেসে এল সোনালী এক জোড়া জুতো—হাই-হিল্ স্যাণ্ডাল-শু। কাজলের পরিচ্ছদাগারে পোষাকটি সঞ্চিত আছে। মানস দৃষ্টিতে কাজল স্থির ক'রে নিল আজ এই সাজ সে পরবে। মন পুলকিত হয়ে উঠল। জোর ক'রে উল্লাস দমন ক'রে ফেলল কাজল।

গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, দেরী করা চলে না। গাড়ি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে

হ'বে ফিরে এসে। এত সাজ অবশ্য না করলেও চলত অসুস্থ লোককে দেখতে যাওয়াই যখন উদ্দেশ্য।

পাকা-সোনার চওড়া চুড় এক হাতে পরতে পরতে কাজল ভাবল, আমার দুঃখিত হওয়া উচিত। নিরঞ্জন যদি কোনদিন সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠে? ওঃ, কি ভয়ঙ্কর কথা! কেন নিরঞ্জন যুদ্ধে গিয়েছিল? কেন শেল লাগল, এত লোক থাকতে ওরই গায়ে? এত সেজে লাভ কি? নিরঞ্জন কাজলকে দেখতে পাবে না তো। মুখেচোখে-হাতেপায়ে তাঁর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তবু. রোগীর গৃহে আনন্দময়ী বেশে যাওয়া সমীচীন—

তবে নিরঞ্জনের কাছে কত লোক যাওয়া-আসা করছে, তারা তো দেখবে। কাজলই যেতে পারে নি। দূর সম্পর্কের আত্মীয় নিরঞ্জন। কিন্তু কাজল যায় নি এতদিন। এখন বাড়ির লোকেরা উদ্যোগী হয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। নিরঞ্জন কেবল ওর কথা জিজ্ঞাসা করে। সর্দিকাশীর অজুহাতে একদিন যাওয়া হয় নি। আর দেরী করা যায় না। বাবা অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। কলেজও বন্ধ আজ।

আচ্ছা, এরা কি জানে একদিন নিরঞ্জন কাজলের কত আপন ছিল? জানে কি তারা চুম্বন-বিনিময়ের সংখ্যা কত? বিবাহে বাধা আছে, তাই নিরঞ্জন যুদ্ধের চাকুরী নিয়ে দেশ ছেড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের পরিণাম দেহে নিয়ে ফিরেছে। কাজলের মমতা হওয়া উচিত।

'কাজল, কাজল, বলো একবার, আমাকে ভালবাসো!'

'আঃ, কি যে করো!'

কবেকার কথা? বেশীদিন নয়, তিনদিন। তবে? না। নিরঞ্জন বলে নি, বলেছে যে, সেই তো কাজলের সাম্প্রতিক মনোযোগের হেতু। তাকে ভালবেসে কাজল ভালবাসার মানে বুঝেছে।

গাড়ির কুশানে হেলান দিয়ে বসল কাজল। বালিগঞ্জ থেকে বরানগর— বরানগরে নিরঞ্জন থাকে। অনেক সময় লাগবে। একা এতটা রাস্তা যাওয়া বিরক্তিজনক। যদি ও থাকতো? অবশ্য ও থাকবে না। আজ নিরঞ্জন একা রাজা। আজকের দিনটি দিতে হবে নিরঞ্জনকে। সব হারালো যে, তার শূন্য-পাত্রে অমৃতের কণা একমাত্র কাজলই পূর্ণ ক'রে দিতে পারে—সম্পূর্ণ মন সে

নিঞ্জনের হাতে তুলে দেবে। শান্ত, সংযত হয়ে বসবে নিরঞ্জনের রোগশয্যায়। কোমল স্বরে সহানুভূতির কথা বলবে।

তাতে কিছু হবে না। নিঃস্বকে একদিনের আহার্য ভিক্ষা দিলে তার তো অভাব মোচন হয় না। সর্বহারাকে ফিরে দিতে হ'বে সম্পদ। যা নেই, তাই আছে দেখাতে হবে। নিরঞ্জন চায় প্রেম, চায় কাজলকে।

কাজলের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ক্ষীণ অ্যান্টিসেপ্‌টিকের গন্ধ ল্যাভেণ্ডার, সুস্বাসকে ম্লান ক'রে ভেসে এল যেন। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অপরিচিত মূর্তি নিরঞ্জনের। যদি একা থাকে দু'জনে? যদি নিরঞ্জন অতীতের মত চায় কাজলকে—মুখের কথায় নয়, আলিঙ্গনের নিবিড়তায়?

আমি পারবো না। এককালে ভালবেসেছিলাম বলে যত অন্ধ-আতুর সকলের রোগশয্যায় সেবা করতে ডাক পড়বে আমার?

আমার কথা কেউ ভাবে না। আমার শক্‌ লাগে না? সর্দিটা সেরে গেছে। কান্নাকাটি ক'রে আবার বেড়ে উঠবে। কাঁদতে তো হবেই।

কাজলের ক্ষোভে, দুঃখে আগেই চোখে জল এল। নিরঞ্জনের অধ্যায় শেষ তো হয়ে গিয়েছিল। আবার নিরঞ্জন দাবী জানাচ্ছে। নিরুপায় হতভাগ্যের দাবী অমান্য করলে ইতিহাসে মানুষ মানুষ থাকবে না। কি প্রয়োজন ছিল নিরঞ্জনের শেলের আঘাত নিয়ে ফিরে আসবার? যথেষ্ট পরিমাণে সাবধান হয় নি যুদ্ধে কেন? এ অবস্থার চেয়ে মৃত্যুও তো ভাল ছিল।

ছিঃ কাজল! গাড়ির নিঃসঙ্গতার মধ্যে কার যেন অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো—কাজল! কাজল! যে তোমার প্রেমে দেশত্যাগ করলো, ধনী-তনয় হয়ে যার এই দশা শুধু তোমারি জন্যে, তুমি কি তারই মৃত্যু কামনা করছো? প্রেম না থাক, মনুষ্যত্বও কি নেই?

মৃত্যু কামনা করবো কেন? শোন তুমি, কে জানি না যে আমাকে এইভাবে অন্যায় তিরস্কার করছো। চির-রোগীর রাজ্যে যাওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। নিরঞ্জনকে এখনও ভালবাসি, তাই বলছি, এই কষ্ট, এই যন্ত্রণা থেকে হতভাগ্যের মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

মিথ্যা কথা! তুমি তাকে ভালবাসা দূরের কথা, দয়াও কর না। চেষ্টা করছ উচিত ভেবে। এখনো তোমার বয়স যে একুশ কাজল, তাই চেষ্টা করছ যা উচিত তাই করতে। এখনো মহৎ হতে চাও, আদর্শ হতে চাও। কিন্তু জানো

না আদর্শতা তোমার গণ্ডীর বাইরে। সর্পশিশু কি জানে দংশনে বিষ নিয়েই তার জন্ম হয়েছে?

আমি নিশ্চয় মহৎ। যাচ্ছি নিরঞ্জনকে দেখতে,—যখন অপেক্ষা করলে বাড়িতে আমার প্রেমিক আসতো। তার সঙ্গ ছেড়েও নিরঞ্জনকেই দেখতে যাচ্ছি! সে আমার একমাত্র ভালবাসা।

কাজল, নিরঞ্জনের বেলায়ও তো তাই ভেবেছিলে। বিবাহ অসম্ভব জেনে বিনিদ্ররজনী অতিবাহিত করতে অশ্রুচিহ্নে উপাধানে কলংক এঁকে। দুই বছরের মধ্যে ভুলে গেলে নিরঞ্জনকে? আবার বরণ ক'রে নিলে অন্য পথিক? ও-মন কি পান্থশালা, কাজল?

না, না। ভালবাসা কাকে বলে জানতাম না নিরঞ্জনের বেলায়। শেখালো যে তাকে নমস্কার করি।

হাসি আসছে। কাজল, আজও হাসি আসে আমার সবজান্তা 'সিনিক' অধরে। দুঃখের হাসি। প্রত্যেকবারেই নব-প্রেমকে মানুষ মনে করে নেয়—এই জীবনের একমাত্র ভালবাসা। প্রত্যেক, প্রত্যেকবার।

আজকের দিন তোমার, নিরঞ্জন! ফুলের মত উৎসর্গ ক'রে দিলাম। বর্ত্ত-মানের কথা ভাববো না আর। কিন্তু অসহায় নিরঞ্জন যেন অসহায়তার অক্টোপাশ-ভুজে গ্রাস ক'রে ফেলেছে কাজলকে। মুক্তি শুধু বর্তমানের বক্ষে।

'নাও আমাকে নাও!' কে বলেছিল? কাজলের বর্তমান প্রেমিক। খালি ওর কথা ভাবছি! আর ভাববো না। আজকের দিনটা অন্ততঃ নিরঞ্জনের থাক।

অন্য কথা ভাবা যাক। টেনিসনের 'লক্সলি হল' কবিতাটি বারে বারে ভেসে আসছে কাণের কাছে কেন? ক্লাসে এটা পড়ানো হয়েছে, তাই কি? না, নিরঞ্জনের স্মৃতি-চর্চিত বলে?

নিরঞ্জন ও কাজলের মত 'লক্সলি হলে'র নায়িকা আত্মীয়-ভ্রাতাকে ভাল-বেসেছিল। মিলন হ'ল না। নায়িকা অন্যের সঙ্গে পরিণয়ে সুখী হ'ল। কিন্তু হতভাগ্য নায়ক তো ভুললো না। তাই লেখা হল ইংরেজ কবি টেনিসনের অনবদ্য কবিতা Locksley Hall।

যুগে যুগে একই ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পরিবেশে। এক সমস্যা সময়ের দর্পণে বারে বারে ভেসে আসে। সময়ের নতুন পুঁজি নেই। ঝোলা খুলে দেখায় তাই পুরাতন মালপত্র। নিরঞ্জন বলেছিল একদিন।

লেকের ধারে বসেছিল তারা সযত্ন-সজ্জিত কাঠের গুঁড়ি বেঞ্চের ওপর। পায়ের কাছে জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। শাদা জলে দু' একখানি লম্বা নৌকা ভেসে যাচ্ছে দাঁড়-শিক্ষার্থীর। প্রেমিক-প্রেমিকা, বৃদ্ধ স্বাস্থ্যান্বেষী। খেলুড়ী-শিশু সৌখিন কুকুরে সবুজ ঘাসের দুই পাড় আচ্ছন্ন। 'গরম মুড়ি, 'চানা গরম,' 'মালাই,' 'পান' হাঁক-ডাকে সরগরম লেক।

নিরঞ্জন জলে ঘাসের চাপড়া ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলেছিল :

'কাজল, আমরা যেন 'লক্‌সলি হলে' বাস করছি, না? এই লাইনগুলো আমাদের জন্যই লেখা হয়েছে। শোন—

'...Cursed be the social lies that warp us from the living truth—' কয়েক লাইন বলে গিয়েছিল নিরঞ্জন জলের দিকে চেয়ে নিচু স্বরে। সেই 'লক্‌সলি হলের' সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তারপরে ক্লাশে সেদিন পড়ানোর সময়ে মনে দোলা লেগেছিল স্মরণের, কিন্তু ব্যথা ছিল না।

কাজলের দীর্ঘ নয়নে স্বপ্নের ছায়া নামলো, আরক্ত স্ফুরিত অধরে হাসি। এই তো নিরঞ্জনের কথা—আপনা থেকে মনে হচ্ছে। শান্ত-সমাহিতভাবে সে নিরঞ্জনের পাশে। ডাক্তারেরা ভয়ের কথা বলেন নি। একটু মাত্র লেগেছে। ভাল হয়ে যাবে। সেরে উঠবে নিরঞ্জন।

কিন্তু কাজলের নিরঞ্জনকে দিয়ে প্রয়োজন নেই। কাজলের প্রেম যে পেয়েছে, সে অসামান্য। রোগ-দীনতা কাছে ঘেঁষতে পারে না। 'লক্‌সলি হলে'র ব্যর্থ প্রেমিক নয় সে। গৌরবে সে গ্রহণ করেছে কাজলকে। কাজলের জীবনে অবশেষে প্রেম এসেছে। সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সুদর্শন মূর্তি প্রেমিকের। কাজল এখন একা নয়। পাশে পাশে চলেছে সে।

কিন্তু ও-কথা ভাববো না। অন্তত যতটুকু সময় নিরঞ্জনের কাছে থাকবো, যতটুকু সময় লাগবে যেতে। খাঁটি মন নিয়ে যেতে চাই—যত কম সময়ের জন্যই হোক।

ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরেছে গাড়ি। আর বেশী দূর নয়। পশ্চিম আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। তন্বীর দেহ কুশনে এলিয়ে দিয়ে কাজল মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করলো :

'Dreary gleams about the moorland flying over Locksley Hall—'

আবার 'লক্সলি হল'? কবিতাটি পেয়ে বসেছে কাজলকে। কেন, কেন কবিতাটা ঘুরে ঘুরে গানের সুরের মত ফিরে ফিরে আসছে? কোন মিল তো নেই আর? যোগসূত্র কবিতাটার সঙ্গে ছিল নিরঞ্জনের আর কাজলের প্রেম। প্রেম তো নেই। তবু ফিরে আসে সুর, ফিরে আসে গান।

ভালো। 'লক্সলি হল' নিরঞ্জনের,—যেমন নিরঞ্জনের এই দিনের ভগ্নাংশটুকু। কবিতাটির আলোচনায় নিরঞ্জনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা চলে।

সুদূরে 'লক্সলি হল' নামে পুরাতন প্রাসাদ-অট্টালিকা। প্রভাতের অস্পষ্ট আলোকে নায়ক পুরাতন স্মৃতির ধ্যানে তন্ময়। পাশে সমুদ্র, বেলাভূমি। বাতায়নে আইভিলতা। সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। 'লক্সলি হলে'র প্রেমিকা এমি। এমি ভালবেসেছিল, এমি ভুলে গিয়েছিল। পিতার ভৎ'সনা, লোকনিন্দা। অপদার্থ স্বামীর প্রেমে, সন্তানধারণে এমির গৃহগত জীবনে সান্ত্বনা এসেছিল। কিন্তু নায়কের প্রেম? সে ওই সমুদ্রের মত অশান্ত প্রবহশীল।

শুধু 'লক্সলি হলে'র কথাগুলোর জন্যই টেনিসনকে অনায়াসে নারী-বিদ্বেষী বলা চলে। 'এত ক্ষীণজীবী, অসার বস্তুকে ভালবেসে আমি মর্মান্তিক লজ্জিত'—বেশ কথা নারীর সম্পর্কে, হল-ই বা প্রতারিত ব্যর্থ প্রেমিকের উক্তি। আর সেই কথাগুলো :—

নারী পুরুষের অধম সংস্করণ মাত্র। আমার সঙ্গে তোমার হৃদয়াবেগের তুলনায় সূর্যকিরণের সঙ্গে ম্লান জ্যোৎস্নার তুলনা সুরের সঙ্গে জলের—'লক্সলি হলে'র দর্শন একদেশদর্শী।

প্রেম জীবনের সার। জীবনে প্রেম এসেছে কাজলের নির্বিঘ্ন ব্যর্থ প্রেম নয়। সফলতায় মণ্ডিত প্রেম। ভাবেশে চোখের ঘন-পল্লব মুদিত হয়ে এল কাজলের। যাচ্ছি, নিরঞ্জনের কাছে যাচ্ছি। প্রেম নেই. তবু সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছি। নিরঞ্জনের কথা ভাবি।

মানুষ অনেক ভুল করে। নিরঞ্জন বলেছিল, তাদের যুক্ত-জীবন 'লক্সলি হলে'র প্রেমিক-প্রেমিকার মত। কিন্তু, নয় তো। প্রেম মিলিয়ে গেল, প্রয়োজন হ'ল না ব্যর্থপ্রেমের ভার বহন করবার।

নিরঞ্জন তাকে 'এমি' বলত। কোন মিলই নেই এমির সঙ্গে কাজলের। এমি লাজুক, ভীরু মেয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যের নায়িকা। পরিস্থিতিটা একটু একটু মিলত মাত্র।

টেনিসনের অন্যায় মেয়েদের ছোট করা। কবিতা লিখতে পারলে কাজল এর উত্তর লিখত।

নিরঞ্জনের বাড়ি এসে গেল প্রায়। গাড়ির চক্রের তালে তালে কেন বাজছে 'লক্‌সলি হল'? কেন, কেন? কোন মিলই তো নেই কাজলের সঙ্গে। নিরঞ্জনের কণ্ঠে শোনা, ক্লাশে পড়া 'লক্‌সলি হল' যেন শতদিক থেকে বেষ্টন ক'রে ধরেছে কাজলকে। গাড়ির চাকার শব্দে গুঞ্জন ক'রে উঠছে একই কবিতা, বিদেশী কবির বিদেশী ভাষায়।

কি বলতে চায় কবিতা কাজলকে? টেনিসন কবি কাজলের উদ্দেশে কি শিক্ষা রেখে গেছেন কালির আঁচড়ে? 'লক্‌সলি হলে'র আর্ত-স্বর কাজলকে কি জানাতে চায় বিস্মরণী—যবনিকার অন্তরাল থেকে? কাজলের কিছু জানবার শেখবার নেই। তবু শোন, কবিতা বলছে :

> 'Oh my cousin, shallow-hearted !
> O my Amy, mine no more !
> O the dreary, dreary moorland !
> O the barren, barren shore !'

হায় আত্মীয়া! হায় চপল-হৃদয়া! হায় এমি, আর তো তুমি আমার নও! ওঃ, কি নিরানন্দ শুষ্ক প্রান্তর! কি নিষ্ফলা, কি নিষ্ফলা তটভুমি!

কে বলছে, কেন বলছে? কাজল, তুমি কি জান না, এখনও কি তুমি বোঝ নি? সমস্ত অসার চপলহৃদয়া নারীর বিশ্বাসহীনতার মূর্ত প্রতীক যে তুমি! তাই শোন, 'লক্‌সলি হল' শোন। শিহরিত হোয়ো না। যুগান্ত পূর্বের কবি তোমার ক্ষণস্থায়ী প্রেমকে লক্ষ্য ক'রে ধিক্কারবাণী রচনা ক'রে গিয়েছেন।

এমি তো তুমি! অস্বীকার কোরো না। হৃদয়হীনা নারী তুমি। তবু কাজল কবি তো তোমাকেই ভালবেসেছিলেন!